দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ৩ জুন, ২০২৪।। ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১
যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

রাজপথে প্রতিবাদ

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৩ জুন - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

'আসছে নন্দীভূত' মহারাজ, কেন আমি চোর বটে...
☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

দুধেল গাই জিন্দাবাদ! ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

ভারতীয় সমাজ জীবনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা
☐ মধুর তনখা ☐ ৮

দেশীয় অর্থনীতির বিরাট সাফল্য : ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

'পরিত্রাণায় সাধূনাং' ☐ ডাঃ আশিষ কুমার মণ্ডল ☐ ১১

শিলিগুড়িতে সন্ন্যাসীদের উপর হামলায় অভিযুক্ত জমি মাফিয়াদের মাথায় কি নবান্নের হাত?
☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১৩

সাধুসন্তদের প্রতি অপমান হিন্দুদের কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ
☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১৫

হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রতি আক্রমণ সীমাহীন তুষ্টীকরণের রাজনীতি
☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১৭

ছিন্ন হোক মিথ্যা অপপ্রচার চক্রান্তের জাল
☐ কুন্তল চক্রবর্তী ☐ ১৯

রাজনৈতিক আক্রমণের শিকার স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী
☐ মন্দার গোস্বামী ☐ ২৩

সন্তদের অপমান সইবে না হিন্দুস্থান ☐ ২৫

আধ্যাত্মিক জগতের নক্ষত্র মহাযোগী বাবা লোকনাথ
☐ গোপাল চক্রবর্তী ☐ ৩১

বঙ্গের আলপনায় জৈববৈচিত্র্য
☐ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৩৩

ধুমধাম আর হুজুগটাই বড়ো, সচেতনতা কোথায়?
☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ৩৫

জলাভূমি ও কলকাতার বন্যা ☐ মোহিত রায় ☐ ৩৬

আচার্য কৌটিল্যের পরিবেশ সচেতনতা ☐ ড. রাকেশ দাশ ☐ ৩৭

মুখ্যমন্ত্রীর চৈতন্য হোক ☐ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ☐ ৪৩

বাংলাদেশে ধর্মান্তরণে নতুন মিশন, শঙ্কিত হিন্দু সমাজ ☐ ৪৫

সংকটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ☐ অজয় ভট্টাচার্য ☐ ৪৮

লাল সন্ত্রাস আর নীল-সাদা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য কী?
☐ সুবল সরদার ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ☐ খেলা : ৩৮ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

প্রকাশিত হবে ১০ জুন, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১০ জুন, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আমাদের জীবনে মা ষষ্ঠী

পুরাণমতে পরাশক্তির ষষ্ঠাঙ্গ অংশভূতা হলেন মা ষষ্ঠী। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে প্রতি মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীদেবী পূজিত হন। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাষষ্ঠীতে পালিত হয় অরণ্য ষষ্ঠী। অরণ্যষষ্ঠী হলো প্রকৃতিপূজা ও উর্বরতার প্রতীক।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাক্ষস শাসন

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। এই দেশের রাষ্ট্রজীবন বিকশিত করিয়াছেন মুনি-ঋষি-সাধু-সন্ন্যাসীরা। এই দেশের নৃপতি সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। যুগে যুগে ভারতবর্ষের নরপতিগণকে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই। উপদেষ্টা রূপে তাঁহারাই রাজাকে কর্তব্যকর্মে প্রেরিত করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের পথপ্রদর্শকরূপে বশিষ্ঠ- বিশ্বামিত্রের নাম ভারতবর্ষের মানুষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের গুরু তথা পথপ্রদর্শক সমর্থ স্বামী রামদাসের নাম আধুনিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাঁহারই প্রেরণায় শিবাজী মহারাজ প্রবল ইসলামি শাসনকালেও হিন্দবী স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষ চিরকাল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগকে শ্রদ্ধার আসনে রাখিয়াছে। এইখানেই ভারতবর্ষ অনন্য। সাধু-সন্ন্যাসীদিগের তপোশক্তিতেই ভারতবর্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রতেজ নির্মাণ হইয়াছে। তাই দুরাচারী রাক্ষস-প্রবৃত্তির লোকেরা সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের লোকহিতার্থ কর্মযজ্ঞকে পণ্ড করিয়াছে। রাক্ষস প্রবৃত্তির লোকেরা লোককল্যাণ এবং জাতিগঠনের কার্যকে সহ্য করিতে পারে না। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ইতিহাসে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। পাঠান-মুঘল শাসনকালেও ইহার ব্যত্যয় হয় নাই। ব্রিটিশ শাসনামলেও নহে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। শুদ্ধি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়া তিনি ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ধর্মান্তরিত মালকানা রাজপুতকে হিন্দুধর্মে পরাবর্তন করাইয়াছিলেন। ব্রিটিশ রাজশক্তি জিহাদিদের উসকাইয়া দিয়া ১৯২৬ সালে সেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করাইয়াছে। স্বাধীন ভারতেও সেই রাক্ষসদের হস্তে কম সাধু হত্যা হয় নাই। গোহত্যা নিরসনে আন্দোলন রত সাধুদিগকে ইন্দিরা গান্ধীর পুলিশ গুলি চালাইয়া হত্যা করিয়াছে। এই সেইদিনও শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তিযজ্ঞ আন্দোলনে উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম সিংহ সরকারের পুলিশ গুলি চালাইয়া বহু রামভক্ত সাধুকে হত্যা করিয়াছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে ওড়িশায় খ্রিস্টান মিশনারির মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা স্বামী লক্ষ্মণানন্দকে হত্যা করিয়াছে। চার বৎসর পূর্বে মহারাষ্ট্রের পালঘরে প্রকাশ্য দিবালোকে দুই সন্ন্যাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা। পশ্চিমবঙ্গও ইহাতে কম যায় না। ১৯৮২ সালে শাসকদলের মদতে প্রকাশ্য দিবালোকে আনন্দমার্গের ১৬ জন সন্ন্যাসী ও ১ জন সন্ন্যাসিনীকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে। মাত্র এক বৎসর পূর্বে পুরুলিয়ায় বর্তমান শাসকদলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা ভিন রাজ্যের কয়েকজন সন্ন্যাসীকে চরম লাঞ্ছনা করিয়াছে। পৌরাণিক কাল হইতে অদ্যাবধি সেই নর-রাক্ষসেরা সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে আক্রমণ করিয়া চলিয়াছে।

ইহা খুবই লজ্জার ও দুঃখের যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সন্ন্যাসীদিগকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। কয়েকদিন পূর্বে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজকে দাঙ্গাবাজ বলিয়া কটূক্তি করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন, স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরিয়া মানব সেবার কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম রক্ষায় তিনি জাগ্রত প্রহরীরূপে কাজ করিতেছেন। এইহেন সন্ন্যাসীকে আক্রমণের কারণ হইল এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটব্যাংকের লোভ। মুখ্যমন্ত্রী ইহাদিগকে 'দুধেল গাই' বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহা আজ পরিষ্কার যে, ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের জিহাদিরাই বর্তমান শাসকদলের মূল শক্তি। মুখ্যমন্ত্রীর উসকানিতেই তাঁহার দলের জমি মাফিয়ারা শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা চালাইয়া সন্ন্যাসীদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদিগকেই অভিযুক্ত করিয়া মিশন বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পরে জনমতের চাপে ভুল স্বীকার করিয়া তালা খুলিয়া দিয়াছে। সুখের বিষয় যে, সাধু-সন্ন্যাসী এবং আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে রাজ্যের সাধারণ মানুষ মুখর হইয়াছেন। গত ২৪ মে হাজার হাজার সাধু-সন্ন্যাসী এবং তাঁহাদের অনুগামীরা জেলায় জেলায় এবং কলকাতার রাজপথে ইহার প্রতিবাদে পদযাত্রায় শামিল হইয়াছেন। বাগবাজার মায়ের বাড়ি হইতে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস পর্যন্ত তাঁহারা পদযাত্রা করিয়া রাক্ষসদিগকে সাবধানবাণী দিয়াছেন। খুবই দুঃখের ও লজ্জার যে, পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় রহিয়াছে সেই রাক্ষসের দল। রাজ্যের মানুষ রাক্ষস-শাসনের হাত হইতে মুক্তি কামনা করিতেছে।

সুভাষিতম্

স্বদেশে পতিতে কষ্টে দূরস্থা লোকয়ন্তিয়ে।
নৈব চ প্রতিকুর্বন্তি তে নরাঃ শত্রুনন্দনাঃ।।

দেশ যখন সংকটের মধ্যে পড়ে, তখন যারা উদাসীনভাবে দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে এবং প্রতিকারের কোনো চেষ্টা করে না, তারা শত্রুদেরই আনন্দ দান করে থাকে।

‘আসছে নন্দীভূত’ মহারাজ, কেন আমি চোর বটে...

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পারসিভড প্যারানইয়া’ বা ভ্রমাত্মকভীতি রোগে আক্রান্ত— আদালতে জানিয়েছিল সিবিআই। পরিবারের সদস্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে অসুখ হয়তো ছুঁয়ে ফেলেছে। তবে তা ভ্রম নয়। মমতা জানেন আগামী ৪ জুন ভোটের ফল প্রকাশিত হলে রাজ্যে প্রকট হবে ‘নন্দীভূত’। মমতা তা বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছেন। তবে সে ভীতি তিনি মানবেন না। পচে যাওয়া বিদেশি বামপন্থী স্লোগান মিলিয়ে ‘আমার নাম তোমার নাম নন্দীগ্রাম’ আওয়াজটা বেশ কিছুদিন থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে ঘুরছিল। ছ’ দফায় রাজ্যের ৩৩ লোকসভা আসনে ভোটের পর সেই হাওয়া আরও জোরালো হয়েছিল বলেই মনে হয়। তা ঝড় হয়ে উঠবে কিনা বলা মুশকিল। তবে ভূত হয়ে দেখা দেবে তার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্ধশতাব্দীর রাজনৈতিক জীবনে মমতার দুটি বড়ো লজ্জা— ১৯৮৯-তে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিদেশি বাম প্রতিনিধি মালিনী ভট্টাচার্যর কাছে হার আর তার পর ওই কেন্দ্র ছেড়ে পলায়ন করে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে বাস।

তারপর ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী বিজেপির রাজ্যে বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে নন্দীগ্রামে পরাজয়। মুখ লুকোতে মমতা মামলা করেছেন। যে কোনো মৃত্যুর শেষ অংশে মস্তিষ্ক বিকৃতি অস্বাভাবিক নয়। যদি না তা অপঘাত হয়। ২০০২ সালের পর থেকেই নরেন্দ্র মোদী সনাতন হিন্দু হৃদয়ের সম্রাট হয়ে উঠেছেন। পরবর্তী তিন ধাপে তিনি দক্ষ প্রশাসক, সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ভারতীয় এবং সব শেষে মর্যাদা (জাতীয়) পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে (রামলালাকে) তাঁর গৃহে ফিরিয়ে দেওয়ার সঠিক দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ জাতীয় পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ভোটার নন। আর অযোধ্যায় রামলালার মন্দির কোনো রাজনৈতিক প্রকল্প নয়। পুরুষোত্তম আদর্শ।

মমতাদের রাজনৈতিক গাড়ি চলে উলটো পথে। সনাতন ধর্মের মধ্যে থেকেও সংখ্যালঘু মুসলমান ভোটের স্বার্থে সনাতনের বিরোধিতা করা। এই বৈপরীত্যের সমাহারে তৈরি মমতাদের ২৭ দলের ইন্ডি জোট। বিভিন্ন ধরনের আস্ফালন করলেও এটা স্পষ্ট নয় মমতা সে জোটে আছেন কি না। ৪ জুন ফল প্রকাশের পর তাঁর ভূমিকার নমুনা পাওয়া যাবে। মার্গারেট নোবেল বা ভগিনী নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সরাসরি শিষ্য ছিলেন বলার পরেও ভদ্রতার খাতিরে কেউ মমতার ভুল ধরিয়ে দেননি। সবাই জানেন পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাস আর মনীষীদের নিয়ে মমতার অজ্ঞতা প্রশ্নাতীত। অনেক শাসকের মতো তিনিও কানে দেখেন আর চোখে শোনেন। এটা মানসিক সমস্যা। তিনি মানেন না। আর ঠিক সেই কারণেই রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের অযাচিতভাবে আক্রমণ করেন।

তাঁর ধারণা ওই সব সংস্থার সন্ন্যাসীরা বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যে মমতা বিরোধী জোট তৈরি করছেন। মমতাকে বিজেপি ভূতে পেয়েছে। যা তাকে তাড়া করছে। তাই মমতা আদালতে, তদন্তে, এমনকী অধ্যাত্মিকতায় বিজেপি দেখছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পর শাসকের বিরুদ্ধে সাধু-সন্তদের প্রতিবাদ মিছিল পশ্চিমবঙ্গে কখনও দেখা যায়নি। মমতার অবিমৃশ্যকারিতায় সন্ন্যাসীরা পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। আমার ধারণা এখানেও মমতা ভুল করছেন। যে সাধু-সন্তরা পথে নেমেছেন তাঁরা কেউ মমতা বিরোধিতায় নামেনি। নেমেছেন সনাতন হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত প্রতিহত করতে। প্রতিবাদ করতে। মমতার ধারণা আদালত থেকে সন্ন্যাসী সবাই বিজেপির ভোটের বোড়ে। এখানেই তার রাজনৈতিক অপরিক্কতার অভাব রয়েছে। সিপিএমের বিরুদ্ধে একসময় ঝোড়ো আন্দোলন তোলা মমতা এখন নিজেই ঝড়ের মুখে পড়েছেন। শাসকের কর্তব্য ভুলে গিয়েছেন। ফলে দেশজুড়ে তাঁর দলের বিরুদ্ধে ‘চোরের দল’ আওয়াজ উঠেছে। এই মুহূর্তে সে আওয়াজ চেপে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। রাজ্যের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির ফাঁক গলে ২০২১-এ মমতা বেরিয়ে গেলেও ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বোধহয় তা হবে না। সনাতনের উপর আঘাতের ফল মমতাকে ভুগতে হবে। আফশোস করে বলতেও হবে, ‘মহারাজ, কেন আমি চোর বটে’। রাজ্যের কনিষ্ঠতম রাজনৈতিক দল তৃণমূল যে লজ্জার ‘চোর’ তকমা পেয়ে গেল তার দায়িত্ব কী করে এড়াবেন মমতা? তিনি তো হোতা।

রাজ্যের কনিষ্ঠতম রাজনৈতিক দল তৃণমূল যে লজ্জার ‘চোর’ তকমা পেয়ে গেল তার দায়িত্ব কী করে এড়াবেন মমতা? তিনি তো হোতা।

দুধেল গাই জিন্দাবাদ!

তোষণেষু দিদি,

ভোটপর্ব শেষ। দিদি আমার এই চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছবে ততক্ষণে লোকসভা ভোটের ফলাফল নিশ্চিত। তবে আগে থেকে আমি বলে রাখছি, আপনার কথাই ঠিক হয়েছে। দুধেল গাইরাই আপনাকে সমর্থন দিয়েছে। যেখানে যেটুকু ভোট পেয়েছেন তাতে তাদের সমর্থনই আপনাকে এগিয়ে দিয়েছে। আরও পেয়েছেন। টাকা বা ভাতা দিয়ে কেনা যায় এমন মানুষেরও অনেক ভোট পেয়েছেন। তবে দিদি একটু অঙ্ক কষে দেখবেন দুধেল গাইরা এবার আর আপনাকে দু'হাত উজাড় করে ভোট দেয়নি। তবে আপনি দুধেল গাইদের দু'হাত তুলে যা যা দিয়েছেন তাতে কোনও খামতি নেই।

এই তো ক'দিন আগেই কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ২০১০ সাল থেকে বিলি করা ওবিসি শংসাপত্র বাতিল। আপনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জানিয়েছেন, হাই কোর্টের নির্দেশ কিছুতেই মানবেন না, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়বেন। কিন্তু দিদি, এটা তো ঠিক যে, হাই কোর্টের এই রায় আপনাদের গালে চপেটাঘাত করেছে। কারণ, কোর্টের এই নির্দেশের আড়ালে রয়েছে মুসলমান তোষণের চেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গে গত এক দশকে ওবিসি শংসাপত্রের সিংহভাগই মুসলমানদের কাছে গিয়েছে, মুসলমান গোষ্ঠীদেরই ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বা ওবিসির জন্য যে ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ আছে, তাতে দু'টি ভাগ, 'ক' ভাগে (১০ শতাংশ) ৮১ গোষ্ঠীর মধ্যে ৫৬টি মুসলমান গোষ্ঠী এবং 'খ' ভাগে (৭ শতাংশ) ৯৯ গোষ্ঠীর মধ্যে ৪১টি মুসলমান গোষ্ঠী। এই কাজ শুরু হয় যখন এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ২০১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মুসলমানদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করে। ছয় মাসের মধ্যে ওবিসি হিসেবে ৪২টি গোষ্ঠীর নাম প্রস্তাবিত হয়, যার মধ্যে ৪১টি মুসলমান গোষ্ঠী। ২০১২ সালে এই সংক্রান্ত আইনটি বিধানসভায় পাশ হয়, পরবর্তীকালে তৃণমূল সরকারের তত্ত্বাবধানে দ্রুত এগোতে থাকে ওবিসি তালিকার সংশোধন। ২০২৩ সালে তালিকায় ১৭৯টি গোষ্ঠীর মধ্যে ১১৮টি ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর থেকে তৃণমূল সরকারের আমলে যত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে, অন্তত দেড় কোটি, তার সত্তর শতাংশেরও বেশি পেয়েছেন মুসলমানরা। জাতীয় অনগ্রসর জাতি কমিশন এ নিয়ে

ভোটের প্রচারের মধ্যেও অন্যায় ভাবে আপনি মুসলমান ইমামদের সরকারি সুবিধা বাড়িয়েছেন। কিন্তু এত করেও লাভের লাভ হলো কি?

পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে এবং মোদী সরকার এ রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোষণের অভিযোগ তুলে চলেছে। তবে কাজটি শুরু হয়েছিল বাম আমলেই, তাই হাই কোর্টের রায়ের পর কেবল তৃণমূল কংগ্রেস নয়, বাম ও কংগ্রেস-সহ সমগ্র বিরোধী ফ্রন্ট 'ইন্ডি'ই অভিযুক্ত।

অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় পড়তে পারে কি! ধর্মের ভিত্তিতে দেশের সম্পদ বাঁটোয়ারা করা চলে না। যদি অত্যধিক মুসলমান গোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকায় ঢোকানো হয়ে থাকে, তার তদন্ত ও বিবেচনা গোষ্ঠীভিত্তিকই হওয়া উচিত, অর্থাৎ কোন মুসলমান সত্যই পশ্চাৎপদ, আর কে নয়, তার বিচারে। মূল কথা, এটি একটি জরুরি বিতর্ক।

এ নিয়ে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। মোদীর অভিযোগ, বিরোধী জোটের উদ্দেশ্য হলো, তাদের ভোটব্যাংকের স্বার্থে তফশিলি জাতি-জনজাতি (এসসি-এসটি) এবং অন্যান্য অনগ্রসর (ওবিসি) শ্রেণীর অধিকার কেড়ে নিয়ে তা মুসলমানদের দিয়ে দেওয়া। তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেসের ইস্তাহার দেখে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী মুসলিম লিগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।' তিনি এও বলেন, 'মা-বোনেদের সঞ্চয়ে কংগ্রেসের নজর পড়েছে।' বাড়িতে সঞ্চিত সোনার গয়না থেকে শুরু করে হিন্দু বিবাহিত মহিলাদের মঙ্গলসূত্রের উপর সম্পত্তি কর চাপিয়ে কংগ্রেস সেই অর্থ মুসলমানদের মধ্যে বিলোতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

অভিযোগগুলি কি মিথ্যা দিদি? ভোটের প্রচারের মধ্যেও অন্যায় ভাবে আপনি মুসলমান ইমামদের সরকারি সুবিধা বাড়িয়েছেন। কিন্তু এত করেও লাভের লাভ হলো কি? □

অতিথি কলম

ভারতীয় সমাজ জীবনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা

মধুর তনখা

আঠারোতম লোকসভা নির্বাচনে ভারত যখন শামিল হয়েছে, তখন বাস্তবের পটভূমিতে নির্মিত, কাশ্মীরে সংখ্যালঘু হিন্দু নিপীড়ন বা কেরালা জুড়ে ব্যাপক ইসলামীকরণ আধারিত সিনেমাগুলি কীভাবে এই নির্বাচনে ছাপ ফেলতে পারে তা একটু বিশ্লেষণ করা যাক। ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করে বর্বরোচিত কায়দায় গণতন্ত্রের হত্যা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দ্বারা স্বৈরাচারী প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার বিষয়গুলি ১৯৭৫ সালে একাধারে গীতিকার ও চিত্র পরিচালক গুলজার তাঁর আঁধি সিনেমার মাধ্যমে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যখন প্রয়াসী হয়েছিলেন, তখন তিনি হয়তো ভাবতে পারেননি যে তিনি একটি ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছেন।

ছবির প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় খ্যাতনামা অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনকে বেছে নেওয়া ছাড়াও, এই বাস্তবধর্মী ছায়াছবিতে কুশলী চলচ্চিত্রকার ইন্দিরার অনুকরণে সাদা ও কালো চুলের মিশ্রিত হেয়ার স্টাইল সমন্বিত সজ্জায় অভিনেত্রীকে সজ্জিত করলেন। বাঙ্গালি অভিনেত্রী, মহানায়িকা সুচিত্রা সেনও তাঁর অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে পরিচালক আকাঙ্ক্ষিত চরিত্রটিকে অবিকলভাবে ফুটিয়ে তুলে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়ে সিনেমাটির প্রতি সিনেমাপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বাস্তবের প্রেক্ষাপটে সিনেমা নির্মাণের ক্ষেত্রে গুলজারের এই চিন্তাধারা ছিল সত্যিই অভিনব। অভিনেত্রী বাছাই থেকে অভিনেত্রীর হেয়ারস্টাইলের এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন সিনেমাটিকে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। সুচিত্রা সেন অভিনীত সিনেমাটির মাধ্যমে বেকারত্বের জ্বালায় জর্জরিত ক্ষুব্ধ জনমানসেও বার্তা পৌঁছায় যে এই সিনেমাটিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রটিই প্রস্ফুটিত হয়েছে, যিনি প্রবীণ সাংবাদিক ও জনসঙ্ঘের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের জেলবন্দি করে গণতন্ত্রকে কার্যত হত্যা করেছেন।

সব দিক থেকেই সেকালে আঁধি ছিল একটি ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র। তা সত্ত্বেও এই সিনেমাটি ভারতীয় ভোটদাতা বা নির্বাচকমণ্ডলীর মননে-চিন্তনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সিনেমাটি মুক্তিলাভের দু'বছর পর দেশ জুড়ে নির্বাচন সংঘটিত হলেও নির্বাচকমণ্ডলীর মনে থেকে গিয়েছিল সিনেমাটির রেশ। এমনকী সেই সময় মোবাইল ফোন বা স্যাটেলাইট টিভির মতো অত্যাধুনিক গ্যাজেট বা ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী না থাকলেও, 'দ্য মাদারল্যান্ড', 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর মতো সংবাদপত্রগুলি ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনের আঙ্গিকগুলি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তুলে ধরার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা ছিল। ১৯৭৭ সালের মার্চে ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচন সংঘটিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন সরকার, প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেত্রী বড়ো মাপের পরাজয়ের সম্মুখীন হলে গোটা দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সেই নির্বাচনে জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের বিপুল জয়ের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল জরুরি অবস্থাকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি। এই নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে বিরোধী জোটের নেতা মোরারজী দেশাই চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী কাশ্মীরি পণ্ডিত বংশোদ্ভূত বলে নিজেকে দাবি করলেও, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি কোনোদিনই ন্যায়বিচার করেননি। তাঁর শাসনকালে বছরের পর বছর ধরে ইসলামিক আক্রমণকারী ও সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিয়মিতভাবে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বাস্তুচ্যুত হয়ে শরণার্থী শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিতে থাকে। এই বাস্তুহারা পণ্ডিতরা অনেকেই উত্তর ভারতে বসবাস শুরু করেন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিতাড়নের মাধ্যমে কাশ্মীর উপত্যকাকে হিন্দু শূন্য করার এই ঘটনার প্রতিফলন সেলুলয়েডে হয় চলচ্চিত্র নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রীর হাত ধরে। তাঁর পরিচালিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস্' সিনেমায় উঠে আসে অত্যাচারিত কাশ্মীরি হিন্দুদের যন্ত্রণার চিত্র ও তাদের প্রবল দুর্দশার বর্ণনা। চিত্র পরিচালক হিসেবে অত্যন্ত সততার সঙ্গে তাঁর তৈরি এই সিনেমার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে কীভাবে, কোন বীভৎস পরিস্থিতিতে বন্দুকের নলের মুখে দাঁড় করিয়ে উপত্যকার ভূমিপুত্র চার লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

সিনেমাটির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীনগরবাসী হিন্দু— বিক্রম বাল বললেন যে বিগত কয়েক শতকে ছয় থেকে সাত বার কাশ্মীরি হিন্দুদের উপত্যকা ছাড়া করা হয়েছে। ঘরছাড়া হয়ে একত্রে, দলবদ্ধভাবে হিন্দুদের এই প্রস্থান বা 'হিন্দু এক্সোডাস'-এর ক্ষেত্রে প্রতিবার সব চেয়ে মর্মান্তিক বিষয়টি হলো যে স্থানীয়রাই পলায়নরত হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠ করেছে, হিন্দুদের পৈতৃক জমিজমার দখল নিয়েছে, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে। কিন্তু কাশ্মীর ফাইলস্ দেখার পর সেই সময়কার উদ্বাস্তু কাশ্মীরি হিন্দুদের মনে ১৯৮৯ সালের সেই কাশ্মীরি হিন্দু এক্সোডাসের স্মৃতি যেন

দগদগে ঘায়ের আকার ধারণ করে, সব দুর্দশা, যন্ত্রণার যেন হয় সম্মিলিত উদ্গীরণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ভ্রষ্ট, সুযোগসন্ধানী ও জেহাদি তোষণের রাজনীতিতে সিদ্ধহস্ত কংগ্রেস সরকার এবং কাশ্মীরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আবদুল্লার মধ্যে গোপন ও অসাধু বোঝাপড়ার কারণেই অগণিত কাশ্মীরি হিন্দুকে বাস্তুহারা হতে হয়।

জম্মু নিবাসী শিক্ষক বিনোদ কুমার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদীজীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা গৃহীত উদ্যোগের কারণেই অনেকগুলি কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবার তাঁদের নিজভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং তাঁদের অনেকেই প্রশাসনিক কাজে পুনরায় যোগদান করেছে। স্থানীয়দের অধিকাংশই এই ধরনের সদর্থক পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। উপত্যকার অর্থনীতি তার চেনা ছন্দে ফেরার কারণেও স্থানীয় আনন্দিত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ইতিবাচক নীতি গ্রহণের ফলে জম্মু-কাশ্মীরের সংখ্যালঘু হিন্দুদের হাতে এসেছে অর্থ উপার্জনের সুযোগ। 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র দ্বারা গৃহীত অ্যাজেন্ডার রূপায়ণে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ত্বরান্বিত হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। স্থানীয় অর্থনীতির গতি সঞ্চারের উদাহরণস্বরূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাশ্মীরে পর্যটক সমাগম। পণ্ডিতরা ও অন্যান্য সব সম্প্রদায় এই নির্বাচনে বিজেপিকেই সমর্থন জানাবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

ভারতীয় জনমানসে, বিশেষত নতুন প্রজন্মের ভোটারদের মননে 'আর্টিকল্ ৩৭০' সিনেমাটিও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। কীভাবে মোদীজীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার উপত্যকার লোকজনকে জাতীয় মূলধারার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, সেই প্রক্রিয়ার বর্ণনা সংবলিত সিনেমা— আর্টিকল্ ৩৭০। আদিত্য জম্ভালে নির্মিত এই সিনেমার মাধ্যমে কাশ্মীরি জনগণকে ভারতীয় মূলধারায় নিয়ে আসার প্রশাসনিক বার্তাটি বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে প্রেরিত ও প্রচারিত হয়েছে।

তুষারাচ্ছন্ন উপত্যকায় যখন শান্তি বিরাজ করছে, ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী যখন সতর্কতার সঙ্গে গোটা জম্মু-কাশ্মীরকে সুরক্ষিত রাখছে, তখন সেই প্রেক্ষাপটে এই নির্বাচনে কাশ্মীরে বিজেপির উত্থানের রয়েছে প্রবল সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় থেকে শুরু করে শ্রমিক শ্রেণী, মহিলা, তরুণ প্রজন্ম ও যুব সম্প্রদায় এই নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে ভোটদানে ব্যাপক উৎসাহী। কাশ্মীরও বিশ্ব জুড়ে অতি মূল্যবান গৈরিক বর্ণের কেশর উৎপাদনের জন্যই বিখ্যাত।

কাশ্মীর থেকে কেরালা— ন্যারেটিভ এখানে সর্বত্র এক ও অভিন্ন। দক্ষিণের রাজ্য কেরালায় আইএসআইয়ের মদতে লালিত-পালিত ইসলামিক কট্টরবাদ এবং তার ফলে উদ্ভূত জেহাদি দৌরাত্ম্যের প্রতি বাম পরিচালিত রাজ্য সরকার সব সময় ছিল উদাসীন ও নির্বিকার। বাম সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামিক জেহাদি সংগঠনগুলির বাড়বাড়ন্ত ও ফুলে-ফেঁপে ওঠার এই প্রেক্ষাপটে 'দ্য কেরালা স্টোরি' সিনেমাটির নির্মাতাদের অনেক অভিনন্দন প্রাপ্য। 'ভগবানের নিজের দেশ' কেরালা জুড়ে উগ্রবাদী ইসলামিক শক্তি কীভাবে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর প্রতিনিয়ত জেহাদ নামিয়ে আনছে— সেই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিপদের বিষয়ে এই সিনেমাটির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে সচেতনতার বার্তা।

সাপ্তাহিক পত্রিকা কেশরীর প্রধান সম্পাদক ড. এন.আর মধু জানিয়েছেন যে অধিকাংশ কেরালাবাসী দূরদর্শনে এই সিনেমাটি দেখেছেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশে এই সিনেমাটি প্রভাব ফেলেছে। ইদানীং তারা এই সিনেমাটির বিনামূল্যে প্রদর্শন বা ফ্রি স্ক্রিনিঙেরও ব্যবস্থা করছে। সিনেমাটির প্রভাব এই লোকসভা নির্বাচনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভোটদানের প্যাটার্নে প্রতিফলিত হতে পারে।

বাম ও কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনে, নির্লজ্জ ভাবে, নিরন্তর মুসলিম তোষণ করে চলা এই দলগুলির অধীনে হিন্দুদের শাসিত হতে দেখেছে কেরালা। সাক্ষী থেকেছে এই দলগুলির একাধিপত্যের। কেরালার যে অংশে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেই অঞ্চলগুলিতে হিন্দুদের ছাইচাপা আর্তনাদ ভোটবাক্সে বিজেপির ভোটবৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

'দ্য কেরালা স্টোরি'-র এই প্রদর্শনী কি ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম? এই সিনেমাটি একজন মালয়ালি হিন্দু নার্সের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনি তুলে ধরে যে মেয়েটি লাভ জেহাদের শিকার হয়ে ইসলামিক স্টেট নামক ভয়ানক জঙ্গি সংগঠনের খপ্পরে পড়ে আফগানিস্তানে পাচার হয়ে যায়। বাস্তব ঘটনা আধারিত এই সিনেমাটি নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় জনমানসে ফেলেছে এক ব্যাপক প্রভাব। সিনেমাটি সনাতন ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে যেন তৈরি করে এক গভীর সংযোগ। এই কারণেই শাসক সিপিএম ও বিরোধী কংগ্রেসের তরফে সিনেমাটি সম্পর্কে ক্ষোভ, অসন্তোষ ও প্রতিবাদের সাক্ষী থেকেছে কেরালা। গত এপ্রিলে দূরদর্শনে এই সিনেমাটি দেখানো নিয়ে গর্জাতে ছাড়েনি এই দুই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, জেহাদি-তোষণকারী রাজনৈতিক দল।

এই সিনেমাটি কি হিন্দু ভোট একত্রীকরণে সহায়ক হতে পারে? প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত, কেরালা নিবাসী, অভিজ্ঞ সাংবাদিক পি.আর. রমেশ এর উত্তরে বলেন যে উত্তরোত্তর বেড়ে চলা জেহাদি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনরোষ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। হিন্দু মেয়েরা ছাড়াও খ্রিস্টান মেয়েরাও ইসলামিক উগ্রপন্থীদের শিকার হয়ে চলেছে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই সিনেমাটি হয়ে উঠেছে যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া, রণদীপ হুড়া অভিনীত ও নির্মিত 'স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর' সিনেমাটি দেয় ইতিহাসের অনেক অজানা পর্বের সুলুক সন্ধান। ২০০২ সালে গুজরাটে উন্মত্ত, ধর্মান্ধ মুসলিমদের দ্বারা করসেবক ও হিন্দু তীর্থযাত্রীবাহী ট্রেনে অগ্নিসংযোগ ও নির্মম গণহত্যার ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত 'দ্য সবরমতী রিপোর্ট' সিনেমাটি মে মাসে মুক্তি পেয়েছে। ইসলামিক জেহাদিদের নৃশংস ক্রিয়াকলাপ কোনো ভাবে না লুকিয়ে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে এই ধরনের ছবিগুলি। চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার ছাতার তলায় 'পলিটিকালি ইনকারেক্ট' বলে যা কিছু আগে ধরে নেওয়া বা ভাবা হতো, সেই অসার ধ্যানধারণার অন্তর্জলি যাত্রা ঘটিয়েছে সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত, সাম্প্রতিক অতীতে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমাগুলি।

(লেখক একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক)

দেশীয় অর্থনীতির বিরাট সাফল্য

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যেভাবেই হোক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে ভারতের জিডিপি পাঁচ লক্ষ কোটি ডলার অর্থাৎ পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে। তার আভাস কিন্তু দেশের শেয়ারবাজারের দিকে তাকালে টের পাওয়া যাবে। ভারতের শেয়ারবাজারের মূলধন গত ২২ মে পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছে। এই প্রথম দিনের শেষে পাঁচ লক্ষ কোটি ডলার হওয়ার ইতিহাস গড়ল তালিকাভুক্ত সব কোম্পানির শেয়ারের মোট মূল্য; শেয়ারবাজারের পরিভাষায় যাকে বলে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন। নির্বাচনের সময় অর্থনীতির সূত্র মেনেই শেয়ারবাজারের গতি কিছুটা কমে গেলেও বিগত কয়েকদিন ধরেই ভালো ফল করছিল দেশের মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) মূল সূচক সেনসেক্স। মাঝখানে মাত্র দু'দিন সামান্য কমেছিল শেয়ার সূচক। গত ৯ মে সূচক ছিল ৭২ হাজার ৪০৪.১৭; বুধবার তা ২৬৭.৭৫ পয়েন্ট বেড়ে ৭৪ হাজার ২২১.০৬ অঙ্কে ওঠে। মাঝখানে ন'টি কর্মদিবসে বিনিয়োগকারীদের শেয়ারের দর বেড়েছে ভারতীয় মুদ্রায় ২২.৫৯ লক্ষ কোটি টাকা।

জানা যায়, গত বছরের ২৯ নভেম্বর বিএসই-এর তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মোট শেয়ারমূল্য প্রথমবার চার লক্ষ কোটি ডলারে ওঠে। গত ২২ মে লেন-দেনের মধ্যে ইতিহাসে এই প্রথম তা পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারে ওঠে। তবে দিনের শেষে তা নেমে আসে ৪.৯৭ লক্ষ কোটি ডলারে। অর্থনীতির সূত্র মেনেই লোকসভা ভোটের মাঝে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকবার কারণে সূচক কিছুটা নিম্নমুখী থাকেই। নির্বাচনে ইস্যুহীন বিরোধীরা এই শেয়ার বাজারের নিম্নমুখী সূচককে কেন্দ্র করেই প্রচার করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছিল যে সরকারে আর মোদী আসছে না, শেয়ার মার্কেটের পতন এই জন্যেই নাকি হচ্ছে। যদিও তা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি সম্প্রতি মুম্বইতে বলেন, 'এই নির্বাচনের পরিবেশে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে একটা কথা বলতে পারি, সরকারের স্থিতিশীলতা হলো শেয়ার বাজারের স্থিতিশীলতার জন্য প্রথম মাপকাঠি। শেয়ার বাজার যাতে স্থিতিশীল হয়, তার জন্য সরকারের স্থিতিশীলতা, নীতির স্থায়িত্ব খুব দরকার।'

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, 'শেয়ার বাজারের জন্য কর নীতির স্থায়িত্ব বিশেষ করে দরকার। এবং সর্বোপরি একটি সংবেদনশীল নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রয়োজন। এই বিন্দুগুলির সাহায্যেই শেয়ার বাজারগুলি স্থিতিশীলতা লাভ করে। শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বাজারগুলি থেকে অস্থিরতা দূর হয়। এর আগে আমরা দারিদ্র্য সূচক, মানব উন্নয়ন সূচক দেখতাম। কিন্তু আজ সাধারণ মানুষ বাজারের অস্থিরতা সূচক বা আতঙ্ক সুচককে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে।'

মানি কন্ট্রোলের রিপোর্ট অনুযায়ী, মে মাসের ভারতের শেয়ার বাজারের ভোলাটিলিটি ইন্ডেক্স ছিল ২০.৭৫-এর কাছাকাছি। গত ৫২ সপ্তাহে ভারতের ভোলাটিলিটি ইন্ডেক্স সর্বোচ্চ ২১.৮৭ পয়েন্ট পৌঁছেছিল। এদিকে গত ৫২ সপ্তাহে দেশের শেয়ার বাজারের আতঙ্ক সূচকের সর্বনিম্ন স্তর ছিল ৮.১৮ পয়েন্ট। কীভাবে শেয়ার বাজারে ভোটের প্রভাব পড়ছে? বিশ্লেষকদের দাবি, নির্বাচনের মাঝে শেয়ার বাজারের ঘরোয়া বিনিয়োগকারীরা ইকুইটি শেয়ারের চেয়ে বেশি অপশন ট্রেডিঙে বিনিয়োগ করছে। মূলত বিভিন্ন সংস্থার ফলাফল সংক্রান্ত ঝুঁকি কমাতেই অপশনের দিকে ঝুঁকছেন বিনিয়োগকারীরা। এদিকে ৪ জুনের আগে ইকুইটি শেয়ারের দাম কমলেও তা ছাড়তে চাইছেন না স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা। এদিকে সেই শেয়ার কিনতে চাইছেন না বিদেশিরা। এই আবহে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে।

এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী, গত এপ্রিল থেকে ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ৪ বিলিয়ন ডলারের শেয়ার বিক্রি করেছে। বা অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, ৪ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ তুলে নিয়েছে। এদিকে অমৌলিক (ডেরিভেটিভ) বিনিয়োগের প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, সাধারণভাবে বিগত কয়েক বছর ধরেই ভালো করছে ভারতের শেয়ারবাজার। তাই ভারতীয় শেয়ারবাজারের এই নজির তৈরি করা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিশ্বজুড়ে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, উচ্চ সুদ হার, লোকসভা নির্বাচন— এসব কারণে ভারতে অস্থিরতা থাকলেও সূচক কিন্তু চাঙ্গা। বাজার বিশেষজ্ঞদের দাবি, বিএসই ও এনএসই— উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মোট মূল্য পাঁচ লক্ষ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র, হংকং, জাপানের মতো বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোর সঙ্গে একাসনে চলে এসেছে ভারত। অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে তা সহায়ক ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, এর ফলে বাজারে বিদেশি বিনিয়োগকারী কোম্পানি ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে ১৫ কোটির মতো ডি-ম্যাট অ্যাকাউন্ট (স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ ইত্যাদি কেনাকাটার ক্ষেত্রে পরিভাষাগত দিক থেকে এগুলোকে সিকিউরিটিজ বলা হয় আর এই সিকিউরিটিজ কেনার জন্য যে অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন, তাকেই ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বলে) রয়েছে। এই বাস্তবতায় খুচরো বিনিয়োগকারীরা বাজারে আসতে উৎসাহিত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান টাইমসের ব্রোকারেজ সংস্থা সিএলএসএর আশা, কয়েক বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে। ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত জাপানকে টপকে যাবে; ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি ২৯ ট্রিলিয়ন বা ২৯ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছাবে। □

‘পরিত্রাণায় সাধূনাং’

ডাঃ আশিষ কুমার মণ্ডল

ভগবানের অবতরণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো সাধুদের পরিত্রাণ বা রক্ষা করা। এটি অবতারের ধর্ম সংস্থাপনের একটি বিশেষ ধাপ। সাধুদের চিত্ত যখন ওষ্ঠাগত হয়, ধর্ম আচরণে বারবার বাধার সম্মুখীন হন, তখন তারা আকুল হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন তাদের সাধু জীবন রক্ষার জন্য। সাধুদের ব্যাকুলতা দেখে ভগবান মনুষ্যরূপ ধারণ করে তাদের অভয় দেওয়ার জন্য ধরাধামে নেমে আসেন।

যদা যদা হি ধর্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

ধর্মসংস্থাপনে সাধুদের রক্ষা কেন প্রাথমিক কর্তব্য বলে শ্রীমদ্ভগবদ গীতাতে উল্লেখ করেছেন, তা ভেবে দেখা উচিত। সাধুরা, সত্য ও সনাতন হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। সাধুরা শুভকর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য অবলম্বন করে সমাজের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য যত্নবান হন। সাধুরা চলমান ধর্ম এবং চলমান গ্রন্থাগার। সাধুদের হৃদয়ে ভগবান নিত্য বিরাজ করেন। সাধুরাই ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতার বাহক। সুষ্ঠ ও সুউন্নত সমাজ জীবনে সাধুদের গুরুত্ব অপরিসীম।

সাধু শব্দের ব্যুৎপত্তি— সাধ্ ধাতুর সঙ্গে উন্ প্রত্যয় করে সাধু শব্দ তৈরি হয়েছে। এর অর্থ যিনি ধর্ম ও মোক্ষ সাধন করে সমস্ত কামনা বাসনা জয়লাভ করেছেন। সাধু মানে যিনি সম্যক বৃত্ত, ভগবদ ভক্ত, সৎসংকল্প।

ভর্তৃহরি বলেছেন— যিনি খলকে সৎ, মূর্খকে বিদ্বান, শত্রুকে মিত্র, পরোক্ষকে প্রত্যক্ষ, হলাহলকে অমৃত বানাতে পারেন তিনিই সাধু।

যিনি সাধু তিনি সম্মানে প্রসন্ন হন না, অপমানে ক্রুদ্ধ হন না, যদি বা ক্রুদ্ধ হন তবুও কটু বচন বলেন না। ভাগবতে উল্লেখ আছে সাধু আমার হৃদয় আমিও সাধুর হৃদয়, আমার অতিরিক্ত সাধুর কেউ নেই, আবার সাধুও আমার প্রাণ। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং সাধু ভৃগুর পাদপদ্ম বুকে ধারণ করেন। সাধু ন্যায়ের আধার, ন্যায় সাধুর আধার। সাধুর বৈশিষ্ট্য আলোচনা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে।

একজন ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাধু চিনব কী করে? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন— যার মন প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত। যিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী। যিনি ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কথা বলেন না। যিনি সকল স্ত্রীলোককে মাতৃ জ্ঞান করেন। যিনি সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন ভেবে সকলের সেবা করেন। গীতাতেও এমন কথা বলা আছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।। (৯/৩০)

—অর্থাৎ অন্যান্য ভক্তির সঙ্গে যে আমার ভজনা করে তাঁকে সাধু বলে জানবে।

মচ্চিত্তা মদ্ গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।

—যারা মন আমাকে অর্পণ করেছেন ও যাদের ইন্দ্রিয় আমাতে উপসংহৃত হয়েছে, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান, বল ও বীর্যাদিবিশিষ্ট আমার কথা প্রসঙ্গ করে এবং আমার বিষয়ে পরস্পরকে বুঝিয়ে সন্তোষ লাভ করেন।

সাধুসঙ্গে কী উপকার হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। আরেকটি উপকার হয় সদাসৎ বিচার আসে। সাধুসঙ্গ ব্যতিরেকে মানুষের মোহ ভাঙার কোনো উপায় নেই। সাধুসঙ্গ আমাদের মনে ত্যাগবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। সর্বত্যাগী সাধুদের সঙ্গে থাকলে অন্যেরাও ত্যাগের মূল্য বুঝতে পারে। ভাগবতও সাধুর গুণকীর্তনে মুখর—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ।।
(ভাগবত পুরাণ ৩/২৫/২১)

—সাধুদের তিতিক্ষা আছে, সব কষ্ট সহ্য করতে পারেন, তাঁরা অনন্ত করুণাশীল, সবার মিত্র, কল্যাণকারী নিরন্তর ভগবানের কথা শ্রবণে ও আলাপনে রত থাকেন। তাদের সংস্পর্শে গেলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি হয়। তাদের ব্যবহার দেখে অনাসক্তির অভ্যাস হয়, নিত্য-অনিত্যের প্রভেদ বোঝা যায়।

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যংঘ্রিরেণুভিঃ।।
(ঐ, ১১/১৪/১৬)

—যে ভক্তের হৃদয়ের কোনো কামনা নেই, যিনি শান্ত এবং ভেদভাবরহিত, সমদর্শী, আমার চিন্তায় রত, তাঁর পদধূলি দ্বারা পবিত্র হওয়ার বাসনায় আমি সকল সময় তাঁর পশ্চাতে চলি।

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।
(আদি পুরাণ ১৯/৩৪)

মানুষের অন্তকরণের বিবর্তনের সমস্ত প্রেরণা আসে সাধুর জীবন থেকে, তাই ভারতের সমাজে সাধু-সন্ন্যাসীদের এত সম্মান। আমরা বলি এই দেবভূমি ভারতবর্ষ মুনি-ঋষিদের পদধূলি ধন্য। সাধুরা যেমন প্রবচন দিয়ে সমাজকে শিক্ষিত করেন আবার তাদের পুণ্য শরীরের চিন্ময় তন্মাত্র নদী— তীর্থ পবিত্র করে। তাই ভারতবাসীরা নিজেদের মনীষীদের উত্তরসূরি বলতে গর্ববোধ করেন। কোনো সমাজে যদি সাধুরা লাঞ্ছিত হন, তাদের সম্মান হরণ করা হয়, তাদের সাধুকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়, তবে

সমাজ নষ্ট হয়।

গোস্বামী তুলসীদাস রামচরিত মানসের সুন্দরকাণ্ডে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সাধুদের অসম্মান হলে কী পরিণাম হয়?

সাধু অবগ্যা কর ফলু ঐসা
জরইনগর অনাথ কর জৈসা।

সাধুকে অপমান করার তাৎক্ষণিক ফল হলো সমস্ত ভালো কর্ম, স্বাস্থ্য, সম্পদ, খ্যাতি ও পরিবার সব পুড়িয়ে দেয়।

মহাদেব মাতা পার্বতীকে বলছেন—

সাধু অবগ্যা তুরন ভবানী।
কর কল্যাণ অখিল কৈ হানি।

—হে ভবানী, সাধু অপমান তুরন্ত সমস্ত কল্যাণের হানি করে।

এজন্য সমাজকে সমস্ত রকম ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উপায় সাধুর জীবন রক্ষা করা, সাধুকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের বেশিরভাগ সময় সাধুদের প্রাণ ও তপস্থলী রক্ষায় উৎসর্গীকৃত। বনবাসকালে সাধুরা যখন রাক্ষসের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্য চাইলেন, তখন তিনি এই প্রতিজ্ঞায় এতটাই অবিচল ছিলেন যে তার অন্তরের ধন সতীসাধ্বী পতিপ্রাণা সীতার বাক্যকেও উপেক্ষা করতে পিছপা হননি— তপ্যহং জীবিতং জাহৎ ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্।

—হে সীতে, আমি তোমাকে, লক্ষ্মণকে অধিক কী নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি, সাধুদের বিপদ থেকে উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা ছাড়তে পারব না। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে সাধুদের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দুষ্টদের দমনের জন্য। সাধুদের পূজা-অর্চনা, তাঁদের সম্মান রক্ষা, তাদের সাধনার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, ভগবত ধর্মকে প্রবাহিত রাখার জন্য তার অনুগামীদের সাধুদের স্মরণ নিতে উপদেশ দান করেছেন, দেবভূমি ভারতের দৈবীসত্তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের পাঁচ হাজার বছরের সাধুভাব নিজ জীবনে প্রকট করেছে। মায়ের সন্তান, রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ বলেছেন, একজন সাধু হবে অথচ দেশপ্রেমিক হবে না, তা হতে পারে না। সমস্ত সাধুই সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার্থে রাষ্ট্র সচেতন ও ভারতপ্রেমী। যে ভূমিতে তাঁকে সাধন করতে হয়, যে ধর্মের আশ্রয় নিয়ে আধ্যাত্মিক রূপান্তর তথা মোক্ষের পথে যেতে হয় তাকে রক্ষা করার জন্য জনমানসে সচেতনতা তৈরি করা সাধুর অবশ্য কর্তব্য। রামজন্মভূমি আন্দোলনে কত সাধু আত্ম বলিদান দিয়েছেন ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস জীবন, বৈরাগ্য, সর্বভূতে সেবা এবং ভারতপ্রেম এক ইতিহাস; কারও সঙ্গে তার তুলনা হয় না, হবেও না। স্বামীজীর গীতার ব্যাখ্যা এবং কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত ভাষণ ভারতের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এবং প্রবুদ্ধ মানুষদের ভারতপ্রেমী ও রাজনীতি সচেতন করেছে। হিন্দুদের নিধনের হাত থেকে রক্ষা করা, তীর্থ সংস্কার করা, সেবা করা এবং বীর্যবান ভারতবাসী তৈরি করার জন্য আদর্শ জীবনযাপন করেছেন স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ।

ভারতবর্ষে যখন সনাতন হিন্দুধর্ম ও সাধুরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা শাসকের দ্বারা লাঞ্ছিত হয় তখন আমরা মর্মাহত হই। পরার্থপর সাধুরা স্বার্থপর মানুষের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন। ক্ষমতা লোভীরা নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সাধুদের ছোটো করার চেষ্টা করে। এই সাধুরা, সনাতন হিন্দু ধর্মের বাহকরা যদি না থাকেন তবে দেবভূমি ভারত নরকভূমিতে পরিণত হবে। ভারত থেকে ভারতের সাধুভাব ও ধর্ম নির্বাসিত হলে কী হবে? স্বামীজীর ভাষায়, ভারত মারা যাবে। যদি ভারত মরে যায় তবে বিশ্ব থেকে আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম, নৈতিকতা, মানবতা উঠে যাবে। তার ফল কী হবে? দেব-দেবী হিসেবে পূজিত হবে কাম ও বিলাসিতা; পূজার পুরোহিত হবে অর্থ; পূজার পদ্ধতি হবে প্রতারণা, পাশবিক বল, প্রতিযোগিতা; বলি হবে— মানবাত্মা। যারা সাধু নিগ্রহ করছেন তাদের জীবনের এই বদ গুণগুলি প্রকট।

ভারতের হিন্দুধর্মকে শেষ করে, সাধুদের লাঞ্ছিত করে ভারতের স্বতন্ত্রতা নষ্ট করে ভারতকে বাগে আনার যে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, গুপ্ত প্রশাসন (ডিপ-স্টেট); তারাই এই স্বার্থন্বেষী ক্ষমতালোভী, পরিবারবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দেশদ্রোহী। তারাই রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ব্যবহার করে। দেশের সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। শত্রুর বিরোধিতা চলবে। সাধুদের সংগঠনগুলি রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। তার চেয়ে বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে সাধুদের শ্রদ্ধার জন্য, তাদের মনে যেন অপ্রসন্নতা না আসে; তাদের কৃপাবারি যেন সতত বর্ষিত হয়। সাংগঠনিকভাবে অনেক মানুষ মঠে-মিশনে, মন্দিরে ধর্মচর্চাতে অংশগ্রহণ করুক, সাধুসঙ্গ করুক। সংগঠিত ভাবে রাষ্ট্রহিত ও ধর্মবোধ জাগ্রত করার শপথ নিক। তা না হলে শুধু রামমন্দির তৈরি হবে, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে না। শ্রীরামের সাধুসেবা, বিনয়ী জীবন ও সাধু সুরক্ষার পরাক্রম না থাকলে শ্রীরামচন্দ্র আমাদের জীবনদেবতা হতে পারবেন না, শুধু রামলালার মূর্তি হয়ে রয়ে যাবেন। এত সংগ্রাম বৃথা হয়ে যাবে। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন। নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

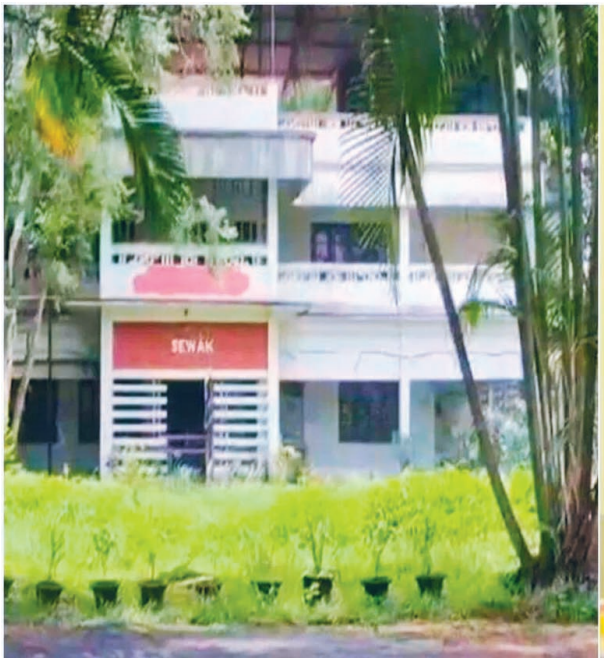

শিলিগুড়িতে সন্ন্যাসীদের উপর হামলায় অভিযুক্ত জমি মাফিয়াদের মাথায় কি নবান্নের হাত?

সাধন কুমার পাল

রামকৃষ্ণ মিশনের অভিযোগের পর প্রদীপ রায় থানায় গেলেও কেন তাকে গ্রেপ্তার বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো না, কেন সেবক হাউসে তালা ঝোলালো পুলিশ, তালার সিলে নাম থাকা ডি কে আসলে কে? কেন কেজিএফ গ্যাং-কে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না? না, এই সমস্ত প্রশ্নের একটিরও উত্তর মেলেনি। একেই বোধহয় বলে সাপের ছুঁচো গেলা। রামকৃষ্ণ মিশন ইস্যুতে ল্যাজেগোবরে দশা মমতা পুলিশের। মিশনে হামলার মূল অভিযুক্ত প্রদীপ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে দুদিন আগেই যে পুলিশ মিশনের সন্ন্যাসীর নামে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করেছিল, পরে সেই পুলিশ স্বীকার করে নিল মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছিল প্রদীপ। চাপের মুখে দিশেহারা পুলিশকর্তারা এদিন সেবক হাউসের তালা খুলে সেখানে পাহারা বসিয়েছে। মিশনে হামলার ঘটনায় এক তৃণমূল যুব নেতা-সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। যদিও এখনো ফেরার মূল অভিযুক্ত। পুলিশের ভরসায় না থেকে কলকাতার একটি নামকরা গোয়েন্দা সংস্থা ২০ মে শিলিগুড়িতে এসে তদন্ত শুরু করতেই মমতা পুলিশের উপর চাপ বাড়ে। এর জন্যই তড়িঘড়ি গ্রেপ্তারি, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের প্রশ্রয় ছাড়া এত বড়ো ঘটনা ঘটতে পারে না। সন্ন্যাসীদের কপালে বন্ধুক ঠেকানো হলো, তাদের অপহরণ করা হলো, হেনস্থা করা হলো। যারা এসব করলেন তাদের বিরুদ্ধে জামিন যোগ্য মামলার ধারা প্রয়োগ করা হলো যাতে অস্ত্র আইন সংক্রান্ত কোনো ধারা নেই। প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বললেন তিনি নাকি জানেনই না যে রকম হামলা কোনো আশ্রমে হয়েছে। সেটা কিছু হয়ে থাকলেও তা পারিবারিক বিবাদ মাত্র। শুধু রামকৃষ্ণ মিশন নয় মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণের হাত থেকে বাদ যায়নি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা। এত কিছু পরেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের সোচ্চার হলেও পথে নামলেন না রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও ভক্তরা।

গত ১৯ মে রাতে শিলিগুলির শালুগাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে হামলা চালায় প্রদীপ রায় নামে এক দুষ্কৃতী। ৪০ জন গুন্ডা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মহারাজাদের নিগ্রহ করে সে। শুধু তাই নয়, পাঁচ সন্ন্যাসী এবং নিরাপত্তারক্ষীদের অপহরণ করে রাতে নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন লাগোয়া এলাকা-সহ বিভিন্ন জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার নিন্দায় সরব বিভিন্ন মহল। কমিশনারেট এলাকায় সন্ন্যাসীদের উপর হামলায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষজনও। এরপর ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ জানায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ। মূল অভিযুক্ত প্রদীপ রায় তার দেড় ঘণ্টা পরে পালটা মহারাজদের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ করে। মূল অভিযুক্ত

পালটা মামলা করার জন্য থানায় যাওয়ার পর তাকে গ্রেপ্তার করা বা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক না করে পুলিশ সেই প্রদীপ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ২১ মে মঙ্গলবার স্বামী অক্ষয়ানন্দ মহারাজের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

ওদিকে পুলিশ যে অক্ষয়ানন্দ মহারাজের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে তিনি আদপে প্রয়াগরাজ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। ১৫ বছর ধরে প্রয়াগরাজেই রয়েছেন তিনি। এহেন সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে কেন শিলিগুড়িতে জমি দখলের অভিযোগ পেয়েই কড়া ধারা প্রয়োগ করা হলো তা নিয়ে কোনও জবাব দিতে পারেনি পুলিশ। রামকৃষ্ণ মিশনের অভিযোগের পর প্রদীপ রায় পালটা অভিযোগ করতে থানায় এলেও কেন তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হলো না তা নিয়েও কোনও গ্রহণযোগ্য জবাব দিতে পারেননি ওই পুলিশ আধিকারিক।

২২ মে বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে শিলিগুড়ির ডেপুটি কমিশনার জানান, ওই জমির মালিকানা দাবি করে প্রদীপ রায় যা বলছে তা মিথ্যা। প্রদীপের দাবি, ওই জমি টুকা সিং নামে এক নিঃসন্তান ব্যক্তির। সেখানে থাকতেন তার মা বিদ্যেশ্বরী রায়। সেই সূত্রে জমি প্রদীপের প্রাপ্য। কিন্তু আদালতের নথি বলছে, জমিটি টুকা সিং বিক্রি করে দিয়েছিলেন হরদয়াল সিং গিল নামে এক ব্যক্তির কাছে। তাঁর কাছ থেকে জমিটি কেনেন এসকে রায় নামে এক ব্যক্তি। তিনি দানপত্র করে জমি ও সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দেন। ফলে জমি যে রামকৃষ্ণ মিশনেরই তা প্রমাণিত।

শিলিগুড়ির সেবক রোডের চার মাইলে প্রায় দুই একর জমি-সহ বহুতল (সেবক হাউস) রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেছিলেন সুনীলকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি। পরবর্তীতে সেই জমি নিয়ে মামলা হয়। আদালতের রায়ে সেই সম্পত্তি এখন মিশনের হাতেই আছে। সেখানে স্কুল তৈরির পরিকল্পনা করেছে মিশন। সেই সেবক

নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদে কান পাতলেই এই অভিযোগ শুনতে পাবেন যে হুমায়ুন কবিরকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দাঙ্গা করিয়েছেন, রামনবমীর শোভাযাত্রায় আক্রমণ করিয়েছেন, যাতে হিন্দুরা ভোট দিতে না যায়।

হাউসেই থাকতেন মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী। ১৯ মে রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ দশ-বারোজন দুষ্কৃতী জোর করে সেখানে ঢুকে তাঁদের শারীরিক নিগ্রহ করে বাইরে বের করে দেয় বলেই অভিযোগ। কয়েক কোটি টাকা দামের ওই জমি দখলের জন্যই হামলা চালানো হয়েছে বলেই মিশনের কর্তারা অভিযোগ তুলেছেন।

সেবক রোডের ওই সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে আছে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রেমানন্দ জানিয়েছেন, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে দুষ্কৃতীরা তাঁদের নিরাপত্তাকর্মী ও সন্ন্যাসীদের মারধর করে মোবাইল কেড়ে নেয়। সেখানকার সিসিটিভি ক্যামেরা নষ্ট করে দেওয়া হয়। প্রত্যেককে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। মুখ খুললে খুন করে ফেলার হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। আমরা আতঙ্কিত। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। যথাযথ পদক্ষেপ হোক সেটাই চাই।'

এই প্রথম নয়, এর আগেও ওই জমি হাতানোর জন্য একাধিকবার সন্ন্যাসীদের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেই অভিযোগও দায়ের করেছিল রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ। তারপরও কড়া পদক্ষেপ হয়নি বলেই জানিয়েছেন মিশনের কর্তারা। সূত্রের খবর, ওই জমি বিক্রির জন্য বেলুড় মঠে মিশনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছেও বেশ কয়েকবার ফোন করেছিল দুষ্কৃতীরা। তাতে লাভ না হওয়ায় ভয় দেখাতেই হামলা করা হয়েছে বলেই অনুমান মিশনের সন্ন্যাসীদের।

শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনে হামলার ঘটনায় অবশেষে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। হামলার তিনদিন পর গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত এখনও অথবা বলে জানা গিয়েছে। এর আগে অভিযোগ ওঠে, রামকৃষ্ণ মিশনের মালিকানাধীন 'সেবক হাউজ' বাড়ির বাইরে পুলিশ তালা লাগিয়ে জমিটা সিল করে দিয়েছিল। সেই সিলে আবার 'ডিকে' ছাপ ছিল। যা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছিল।

পুলিশ সিল করার কথা অস্বীকার করছে। শিলিগুড়ির সবচেয়ে বড়ো নির্মাণ সংস্থার সঙ্গে সেই সিলের সম্পর্ক আছে কি না, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনাকে পারিবারিক বিবাদ বলে উল্লেখ করে কেন? জমি মাফিয়াদের আড়াল করার পিছনে কি তৃণমূলের সেই সুপরিচিত কমিশনের খেলা? এরকম অনেক প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে।

শুধু রামকৃষ্ণ মিশন নয়, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকন এই সমস্ত ধর্মীয় সংগঠন এখন মুখ্যমন্ত্রীর টার্গেটে রয়েছে। নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদে কান পাতলেই এই অভিযোগ শুনতে পাবেন যে হুমায়ুন কবিরকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দাঙ্গা করিয়েছেন, রামনবমীর শোভাযাত্রায় আক্রমণ করিয়েছেন, যাতে হিন্দুরা ভোট দিতে না যায়। কিছুদিন আগেও হুমায়ুন কবীরকে মুখ্যমন্ত্রী দেখতে পারতেন না। এখন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে বহিরাগত ইউসুফ পাঠানকে জেতানোর জন্য ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হুমায়ুন কবির মুখ্যমন্ত্রীর চোখের মণি হয়ে উঠেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের বুকে যে সর্বনাশা খেলা শুরু করেছেন এর শেষ কোথায়? □

সাধুসন্তদের প্রতি অপমান হিন্দুদের কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ

ইমাম অ্যাসোসিয়েশন যখন সরাসরি লিখিতভাবে মুসলমানদের তৃণমূল দলকে ভোট দেওয়ার ফতোয়া জারি করে, তখন মুখ্যমন্ত্রী মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন কেন? এটা কি দ্বিচারিতা নয়?

আনন্দ মোহন দাস

কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক নির্বাচনী জনসভায় কয়েকটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং ইসকনের নাম উল্লেখ করে যে কদর্য ভাষায় তাদের সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করেছেন, তার নিন্দার ভাষা নেই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে কোনো মুখ্যমন্ত্রী ইতিপূর্বে এই ধরনের নাম উল্লেখ করে সাধু নিন্দা করেছেন বলে মনে হয় না। হিন্দ সমাজ সাধু-সন্ন্যাসীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং তাঁদের ত্যাগময় জীবনকে সম্মান দেয়। কিন্তু তাঁদেরই দাঙ্গাবাজ, সাম্প্রদায়িক ও অসাধু আখ্যা দিয়ে অপমান করা সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে অপমানেরই শামিল। এই সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পৃথিবীব্যাপী লক্ষ লক্ষ ভক্ত রয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের হাজার হাজার কৃতী ছাত্র পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যকে কুরুচিকর আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নাম করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজকে (কার্তিক মহারাজ) কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করে তাঁর সাধু হবার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। লোকসভা নির্বাচনে মুসলমান ভোটের লোভে মুখ্যমন্ত্রী তুষ্টীকরণের শেষ সীমা পার করেছেন। দেখা গেল, কদর্য ভোট রাজনীতির কবলে পশ্চিমবঙ্গের মঠ-মিশনও আক্রান্ত হয়ে গেল। তিনি নির্বাচনী সভায় যে ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও ইসকনের সাধুসন্তদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যে আক্রমণ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে সনাতন হিন্দুসমাজের ওপর আক্রমণ। এই ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি একেবারেই অরাজনৈতিক এবং ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপস্যা ও সেবার ব্রত নিয়ে এদের সন্ন্যাসীদের জীবন অতিবাহিত হয়। এদের হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

থেকে লক্ষ লক্ষ যুবক সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। বলাবাহুল্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান যেখানে সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রত্যেক বাবা-মা স্বপ্ন দেখেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বাগ্রে পৌঁছে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সরকারি উদ্যোগ অনেক পরে দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সংগঠনগুলি মানব কল্যাণে সেবা ও শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে থাকেন। শিব জ্ঞানে জীব সেরা যাঁদের আদর্শ, তাঁদের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করে বিশ্বের দরবারে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে হেয় করা হয়েছে। বর্তমান শাসকদলের এই ঘটনা সিপিআইএম শাসনকালে কলকাতার বিজন সেতুর উপর আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার কথা মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য যে রাজ্যে মহিলাদের ওপর সন্দেশখালির মতো অত্যাচারের ঘটনা ঘটে, যেখানে মাতৃজাতির সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়, সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীদের অপমান, অসম্মান অস্বাভাবিক কিছুই নয়। এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানব কল্যাণের ব্রত নিয়েছে। সন্ন্যাসীরা সংসারের মোহ কাটিয়ে জীবনে ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং সম্পূর্ণ সমর্পণের ব্রত নিয়েছেন। মানবতার সেবাই তাঁদের জীবনের মূল মন্ত্র।

সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের অপমানের কারণ কি দুধেল গাইদের সন্তুষ্ট করা এবং ভোটের বাক্সে ডিভিডেন্ড তোলা? মুখ্যমন্ত্রীর সাধু-সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত আক্রমণ দেশের সমস্ত হিন্দুকে আহত করেছে। তিনি বিচার করছেন কে সাধু আর কে সাধু নয়। তিনি তাঁদের জীবনাচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি নির্বাচনী আবহে প্রকাশ্যে সন্ন্যাসীদের নাম করে যে ভাবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্তিক মহারাজের সমালোচনা করে মিথ্যাচার করেছেন তা একপ্রকার নজিরবিহীন। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য আপামর ভক্ত ছাড়াও সাধারণ হিন্দুর জন্য অপমানস্বরূপ।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কতিপয় সন্ন্যাসী প্রত্যক্ষ রাজনীতি করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের নাম উল্লেখ করেন। তাঁর ক্রোধের কারণ হলো, এনারা বর্তমান শাসকদলের দুর্নীতি, তুষ্টীকরণ ও মিথ্যাচারকে সমর্থন করেন না। অনেকে মনে করছেন, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলিম ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের মতো বর্তমান শাসকদলকে ভোট দেওয়ার ফতোয়া জারি করেন না বলেই মুখ্যমন্ত্রীর রাগ।

শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ মঠও মিশনকে নিয়ে মিথ্যাচার নয়, তিনি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকেও রাজনীতির এই ঘৃণ্য কোন্দলে টেনে এনেছেন। সকলেই জানেন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যার পরিধি আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃত। সনাতন হিন্দু পরম্পরার এমন একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে এহেন মিথ্যা আরোপ শুধুমাত্র লজ্জার নয়, চরম অপমানের। এহেন ঘটনায় তাদের অনুগামী-সহ সাধারণ মানুষ যারপরনাই ক্ষুব্ধ।

এখন সময় এসেছে পরিবর্তনের; সময় এসেছে ধর্ম সংস্থা পনের। মনুষ্য জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু এই ধরনের মানব কল্যাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি চিরকাল বেঁচে থাকবে। তাহলে কি শাজাহানদের সন্তুষ্ট করতেই এই ধরনের অন্যায় আক্রমণ? রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণের পরই শিলিগুড়ির সালুগাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের ওপর আক্রমণ এবং আশ্রম সিল করে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। স্বামী অক্ষয়ানন্দের ওপর মিথ্যা এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল যিনি পনেরো বছর আগে অন্য আশ্রমে স্থানান্তরিত হয়েছেন। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ জমি মাফিয়ার এফআইআর গ্রহণ করেছে। পরে অবশ্য জনমতের চাপে পুলিশ ভুল স্বীকার করেছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পুজ্য সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আক্রমণ ও হুমকি দিয়েছেন তা সমস্ত শালীনতা ছাড়িয়ে গেছে। কার্তিক মহারাজ এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তিনি হাইকোর্টে সুরক্ষার আবেদন করেছেন। সাধুসন্তদের ওপর আঘাতের অর্থ সনাতন সংস্কৃতির ওপর আঘাত। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কার্তিক মহারাজ নাকি তৃণমূলের এজেন্ট বসতে দেবেন না বলেছেন। মহারাজ এই অভিযোগকে সর্বৈব মিথ্যা বলে জানিয়েছেন। এরজন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে মানহানির নোটিশ দিয়ে চারদিনের মধ্যে ক্ষমা চাইতে হবে বলেছেন, অন্যথায় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আসানসোলের রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীকেও বিজেপির পক্ষে কাজ করার মিথ্যা অভিযোগে আক্রমণ করেছেন।। ইসকনের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ করেছেন। যা তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সন্ন্যাসীরা সর্বস্ব ত্যাগ করে সমাজ সেবার ব্রত নিয়েছেন। তাঁরা আর্তের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ। তাঁরা আখের গোছানোর জন্য অথবা কাটমানির লোভে সন্ন্যাসী হননি। তাঁরা টাকা কামানোর জন্য অথবা দুর্নীতি করে অর্থ উপার্জন করে ইমাতর গড়তে আসেননি। তাঁদের অপরাধ তাঁরা হিন্দু সন্ন্যাসী এবং হিন্দুদের হয়ে কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গের বুকে সাধু-সন্ন্যাসীদের অপমানের অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দকে আপমান। এই অপসংস্কৃতির আমদানিতে পশ্চিমবঙ্গের সাধু সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সাধু সমাজও এই রাজ্যে সুরক্ষার অভাব বোধ করছেন। সেজন্য সমগ্র দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রতিবাদ জানিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

ইমাম অ্যাসোসিয়েশন যখন সরাসরি লিখিতভাবে মুসলমানদের তৃণমূল দলকে ভোট দেওয়ার ফতোয়া জারি করে, তখন মুখ্যমন্ত্রী মুখে কুলুপ এঁটে কেন থাকেন? এটা কি দ্বিচারিতা নয়? নাকি তৃণমূলের সমর্থনসূচক বলেই নীরব থাকেন? তাঁর দলীয় এমএলএ হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদ জেলার ৩০শতাংশ হিন্দুকে মেরে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিলে তিনি সচেতন ভাবেই চুপ থাকেন। স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ দৃঢ়ভাবে সনাতন সংস্কৃতির কথা বলেন, হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম রক্ষার কথা বলেন, মানবতার সেবায় দুর্গম স্থানে পৌঁছে যান, তাই কি তাঁর বিরুদ্ধে এত বিষোদ্গার? মুখ্যমন্ত্রীর সীমাহীন তুষ্টীকরণের এ এক নির্লজ্জ নজির।

হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি আক্রমণ
সীমাহীন তুষ্টীকরণের রাজনীতি

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গ তথা ভারতের সন্ন্যাসী পরম্পরার ইতিহাস এবং তাঁদের ক্ষমতা ও প্রভাব সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। বঙ্গদেশের সন্ন্যাসী সমাজ একদিন সারা ভারতকে, বিশ্বকে দেখিয়েছিল ঔপনিবেশিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে কেমন করে লড়াই করতে হয়। কেমন করে অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হয়। যখন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে কেউ কোনো আওয়াজ ওঠানোর সাহস দেখাতে পারেনি, তখন সেই ১৭৭০ সালে এই বঙ্গপ্রদেশের সন্ন্যাসীরাই শুরু করেছিলেন বীরত্বের সংগ্রাম। সেদিন এই বঙ্গের মাটি সাক্ষী থেকেছে ভবানী পাঠকের এবং দেখেছে বারাণসী, রংপুর, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুমিল্লার সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ রূপ। নেতৃত্ব দিয়েছেন সাধক কৃপানাথ, মোহন গিরি, দয়ারাম শীল। এঁরা সবাই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কিন্তু তোপ দেগেছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। এই বঙ্গের মাটিতেই সেই সন্ন্যাসীরা সঙ্ঘটিত করেছিলেন এক প্রবল বিদ্রোহের।

অত্যাচার ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীরাও যে নেতৃত্ব দিতে পারেন তা বহু বছর আগেই প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত। তারপরেও কোন বুদ্ধি, রুচি ও আক্কেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার সাধু-সন্ন্যাসীদের কটাক্ষ করে ভাষণ দেন, রাজনৈতিক কদর্যতায় টেনে আনেন সাধু-সন্ন্যাসীদের নাম। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ আগাগোড়া হিন্দু বিরোধী তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটব্যাংককে পৈতৃক সম্পত্তির মতো ব্যবহার ও তোষণ করেন তাও সুস্পষ্ট। বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের আমাদের এক অধ্যাপক বলেছিলেন অধঃপতনের কোনো সিঁড়ির দরকার হয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরণের সিঁড়ির কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তিনি যে ধরনের নৈতিক অধঃপতন প্রদর্শন করে চলেছেন, তার বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো রাজনৈতিক খোলামঞ্চে 'কোনো এক কার্তিক মহারাজ', ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ও ইসকনের বিরুদ্ধে একের পর এক লাগামহীন তির্যক বক্তব্য রেখে। ভোটযুদ্ধের বাজারে নির্লজ্জ তোষণ কার্ড খেলতে খেলতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিশেহারা প্রলাপ ভাষণের বহিঃপ্রকাশ যে এমনভাবে তিন-তিনটি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের উপরেও পড়বে তা সত্যিই ধারণাতীত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ লক্ষ ভক্তের আবেগে আঘাত করেছেন। অসম্মান করেছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মতো প্রতিষ্ঠানকে। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে তিনি বুলি ঝাড়ছেন, 'সব সাধু সজ্জন সমান হয় না, সব সাধুও সাধু নয়।' বলেছেন, ' ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। শ্রদ্ধার তালিকায় ওরা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন। কার্তিক মহারাজ। তিনি ওখানে বলেছেন তৃণমূলের এজেন্ট বসতে দেব না।

সেই লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না....।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিই কি কখনো ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে শ্রদ্ধা করেছেন? করলে তো বিগত দিনেও বলতেন না 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ দাঙ্গা করে।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রাজ্যের হিন্দুদের ও হিন্দুধর্মের ওপর আদৌ যে কোনোরূপ শ্রদ্ধা নেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রাজনৈতির মঞ্চে আবোলতাবোল শ্লোক উচ্চারণ এবং তারজন্য বিন্দুমাত্র সংশোধন বা ক্ষমা যাচনা কোনোদিন করেননি। সরস্বতীপূজার মন্ত্রকে তিনি সম্ভবত তাঁর অর্থহীন স্বরচিত কবিতা মনে করেন। ঠিক এইরকম তিনি কিন্তু আর কোনো বিশেষ ধর্মের সঙ্গে করেন না। ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা, ইমামদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য— নৈব নৈব চ। তখন তাঁর সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় অতি সজাগ ও সক্রিয়ভাবে দুধেল গাইদের ভোটব্যাংক আগলে রাখে। হিন্দুধর্মের যথেচ্ছ অপমানটাও পরোক্ষভাবে ওই নির্দিষ্ট ভোটব্যাংককেই সন্তুষ্ট রাখার সুকৌশল রাজনীতি।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় দাঙ্গার জন্য মুখ্যমন্ত্রী দায়ী করেছেন কার্তিক মহারাজকে, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি ভুলে গেলেন ২০১৬ সালের মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের দীপঙ্কর দত্তের আবজারভেশান? সেখানে মাননীয় বিচারপতি রাজ্য প্রশাসন সম্পর্কে বলেছেন, "clear cndeavor to appease the minorities." বিচারপতি দত্ত আরও বলেছেন, "Pit one community against another" এবং "there has been a clear endeavour on the part of State government to pamper and appease the minoroty section of the public at the cost of the majority section without there being any plausible justification..." তারপরেও মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ এবং প্রশাসনিক ব্যবহারের জবাব তো এলোই না, বরং আরও বেশ অনেক ধাপ অবক্ষয়িত হয়ে সরাসরি আঘাত চলল আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকেও রাজনৈতিক দড়ি টানাটানিতে নিয়ে এলেন। এর চাইতে বড়ো অবমাননা আর কীই-বা হতে পারে!

তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা ভোট দানে পর্যন্ত বিরত থাকেন। কিন্তু জেনে-শুনেও যখন মুখ্যমন্ত্রী এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য রাখেন, তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে তা অবশ্যই অতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

হিন্দুধর্মের ওপর মুখ্যমন্ত্রী বারবার আক্রমণাত্মক হচ্ছেন, কারণ তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। তাঁর কটূক্তির জবাবে সাধু-সন্ন্যাসী এবং তাঁদের অনুগামীরা গত ২৪ মে কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদ পদযাত্রায় শামিল হন। মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় জানেন না যে, একদিন নাগা সন্ন্যাসীরা রুখে দাঁড়ানোতেই মুঘল সৈনিকরা কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দখল করতে পারেনি। ইতিহাস এবং বর্তমান কোনো কিছুর কাছেই মুখ্যমন্ত্রী সুস্থির নন, তাই এখন পর্যন্ত তিনি সাধু সমাজের কছে ক্ষমাটুকুও চাইলেন না। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার, গত ১৮ মে মুখ্যমন্ত্রী যখনই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর আক্রমণ হানলেন, তার কয়েক ঘণ্টা পরেই শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর নেমে এল আঘাত। আরও একবার প্রকাশ্যে এল, প্রশাসনিক প্রধান এবং জমি মাফিয়ারা যে একই মুদ্রার এপিঠ- ওপিঠ মাত্র। প্রশাসনকে হাতের মুঠোয় করে জমি মাফিয়ারা শিলিগুড়ির সেবক রোডে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি জবরদখলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সন্ন্যাসীদের ওপর হামলা চালায়। মুখ্যমন্ত্রীর নজরে ও বিচারে শেখ শাজাহানরা সমাজসেবক, আর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হলো দাঙ্গাবাজ। তবে একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী তো পুলিশ মন্ত্রীও। তিনি বিগত দিনেও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন।

এরা যদি সত্যিই কোনোরকম দাঙ্গার ছক কষে থাকেন তবে পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে তিনি কেন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি?। এ কেমন প্রশাসনিক পরিকাঠামো এবং ইন্টেলিজেন্স! দাঙ্গাবাজ সন্ন্যাসীরা পথে ঘুরছেন আর পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক মঞ্চে ঝড় তুলছেন— বড্ডো দৈন্য রাজনৈতিক স্ক্রিপ্ট হলো না কি? তিনি যে বিভাজন ও বিদ্বেষের রাজনীতি করছেন, তা কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা।

হিন্দু বিরোধী বলেই তো ২০২১ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতা নরসংহারের দিন মুখ্যমন্ত্রীর দল 'খেলা হবে দিবস' পালন করেছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের যতদূর অবমাননা করা যায় ততটাই করছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তাঁর দল। সন্ন্যাসী-সমাজ যেন ভিজে মাটি। রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার আঁচড় তাঁদের বারবার সহ্য করতে হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালেও (১৯৬৬, ৭নভেম্বর) গোহত্যার প্রতিবাদে সংসদ ভবনের বাইরে ধরনা রত সাধুদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ। তারপর কমিউনিস্টদের বিজন সেতুর ওপর সাধুহত্যা, পালঘরে সাধু হত্যা, কদিন আগেও পুরুলিয়াতে সাধু লাঞ্ছনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং সেই ধারাকে আরও একবার প্রাসঙ্গিক করলেন। তাঁর এহেন আচরণ কি নির্বাচনী বিধিভঙ্গ নয়? এ প্রশ্নটাও যে প্রাসঙ্গিক হচ্ছে ভোট মরসুমে।

আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দুধেল গাইদের খুশি করতে সাধু-সন্ন্যাসীদের দাঙ্গাবাজ সাজাচ্ছেন। মমতার জন্মদাতা দল কংগ্রেস তো হিন্দু টেররিজমের ধুয়ো তুলেছিল। তারা স্বামী অসীমানন্দ ও সাধ্বী প্রজ্ঞাকেও চক্রান্ত করে দাঙ্গাবাজ সাজিয়েছিল। সেদিন হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের ওপর কংগ্রেসের চরম প্রতিশোধপরায়ণতার আচরণ দেখেছিল সমগ্র দেশ। শতগুচ্ছ অভিযোগ সেদিন তাঁদের ওপর আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যতটা ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল, তাঁদের বেকসুর খালাস এবং তার কারণ কিন্তু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গের অবতারণা এজন্যই করা হলো যে সেদিন কংগ্রেস সরকার স্যাফ্রন টেররিজমকে একটা সেনসেশনাল রূপ দিতে চেয়েছিল।

রাজনৈতিক জারিজুরিতে হিন্দু বিরোধিতা এবং সন্ত্রাস প্রতিপালন একুশ শতকের একটা নতুন ডিজাইন। কদিন আগেই স্তালিন-পুত্র উদয়নিধি খোলামঞ্চে বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম হলো ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মতো, তাকে ধ্বংস করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ও ইসকনের দিকে আঙ্গুল তোলা সেই স্যাফ্রন টেররিজমে মনন-জারিত ছাড়া আর কিছুই নয়। □

কান্না

কান্না মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ দুঃখে কাঁদে। আনন্দেও কাঁদে। আবার কারও মন অন্যের ভালো করতে না পেরে কাঁদে। আজকের পত্র মূলত এই কান্না নিয়ে। কান্নার প্রকার ভেদ নিয়ে। অনেক দিনের কথা। তখন কংগ্রেস সরকার আমাদের রাজ্যে। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। আজকের তৃণমূলের মতো তখন যুব কংগ্রেসের খুব দাপট ছিল। আমি কলেজে পড়ার সময় আমার পরিচিত এক ছাত্রপরিষদ নেতা ছিলেন। তিনি আবার যুব কংগ্রেসের নেতাও ছিলেন। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ করলেও তার সঙ্গে আমার সখ্য বজায় ছিল। হাওড়ার শিবপুরে বড়ো ঘড়ির সংলগ্ন বাড়িটা ছিল গুপ্তদের। সেই বাড়ির রাস্তার দিকে নীচের তলায় ছিল কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের আড্ডা। একদিন ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় ওই যুব কংগ্রেসের নেতাটি আমাকে ভিতরে ডাকেন। যাওয়ার পর বসতেও বলেন। বসে কিছু কথাবার্তার পর দূর থেকে আসা এক প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে আমায় ইশারা করে বলে, দেখ, ও কেমন কান্নাকাটি করবে। আমি চুপ করে রইলাম। যথারীতি ওই ভদ্রলোক বলে, দাদা আমার ছেলের চাকরিটার কী হলো? কথা বলতে বলতেই ওই প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখ জলে ছলছল করে উঠল।

আমার যুব কংগ্রেসের বন্ধুটা তাকে দাবড়ে বলল, কাকু আমি তো আপনাকে বলেছি, কাজটা হলে আমি নিজেই খবর দেব। আপনাকে আসতে হবে না। ভদ্রলোকটি জবাবে বলে, মন মানে না। মনে হয় আপনার কাছে আসলেই কাজ হবে। তাই আসি। তিনি চলে গেলে আমার বন্ধুটি বলে, মামার বাড়ির আবদার। বলেই অট্টহাসি শুরু করে দেয়। ওই ঘটনা আজও আমার মনে টাটকা আছে। কারও চোখের জল দেখে কেউ হাসতে পারে আমি ওই দিনই জানলাম। এর বেশ কয়েক মাস পর আমার ব্যাংকের এক কাস্টমার খান সাহেবের জিটি রোড পিলখানার আড্ডায় তার চেলা দেবুয়া পুরো নাম দেবু ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। খান সাহেব ও দেবুয়া কংগ্রেস করলেও আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত তা ভালো করেই জানতো। দেবু ঘোষের বাড়িতেও যেতাম। ওই যাওয়ার সূত্রে জানতে পারি আমার কলেজের পরিচিতি ওই যুব কংগ্রেসী নেতার কীর্তিকলাপ। মানস নামের এক বাগনান কলেজের ছাত্র পরিষদের নেতা সেই সময় সিপিআইএম-এর হাতে মারা যায়।

আমার ওই যুব কংগ্রেসী গুণধর বন্ধু— দেবু ঘোষ ও নিহত মানসের স্ত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে মানসের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য সংগ্রহে যায়। দেবু ঘোষ জানায় ওই যুব কংগ্রেস নেতা যা টাকা তোলে তার মাত্র দশ শতাংশ মানসের স্ত্রীকে দিয়ে বাকিটা নিজে আত্মসাৎ করে। নিহত মানসের স্ত্রী বুঝতে পারলেও মুখে কিছু না বলে শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এরপর দেবু জানায়, সে আর কংগ্রেস করবে না। বসে যাবে। আরও বলে, আমি মরে গেলেও আমার বিধবা স্ত্রীকে দেখিয়ে এই ভাবে টাকা তুলবে। মানস মার্ডার হয়ে আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আজ দেবু ঘোষ (দেবুয়া) বেঁচে নেই। বেঁচে নেই আমার সেই যুব কংগ্রেসের বন্ধুটিও। এই ঘটনা আমাকে ভীষণ ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে।

মানুষের জন্য কাজ করতে না পারার কান্না আমাকে ভীষণভাবে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। বলতে অসুবিধা নেই আমি আমার সংগঠনের সাহায্যে পঞ্চাশের বেশি মেয়ের আমার ব্যাংকে সাব স্টাফ ও পার্ট টাইম সুইপারে চাকরি করে দিতে সরাসরি সাহায্য করেছি। তাদের অনেকেই বর্তমানে কাজ করছে। এ ছড়া অম্বুজা সিমেন্ট এবং বহু সওদাগরি অফিসে অনেককে কাজে লাগিয়ে তাদের মা-বাবার আশীর্বাদে বর্তমানে সুখে দিন কাটাতে পারছি।

আজ রাজধানীতে মোদীজীর চোখের জল নিয়ে রাহুল, মমতা, লালু, অখিলেশরা যে কৌতুক করছে তাদের বলতে চাই, চোখের জল মোদীজীকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা ও অবিচল করেছে। তাই তিনি বিগত দশ বছরে একদিনও ছুটি নেননি। যারা নরেন্দ্র মোদীর চোখের জল নিয়ে কৌতুক করে তাদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা কতটা?

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

আন্দামান নিকোবর কি বিনোদন বা পর্যটন কেন্দ্র?

আজকাল অনেক ভ্রমণপিপাসুই আন্দামান নিকোবরকে পর্যটন বা বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। কিন্তু সত্যিই কি সেটা হওয়া বাঞ্ছনীয়? কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ যেমন আমাদের কাছে তীর্থক্ষেত্র, পুণ্যভূমি আন্দামান, নিকোবরও আমাদের কাছে তেমনই এক তীর্থক্ষেত্র বা পুণ্যভূমি হিসেবে বিবেচিত হবে এটাই আশা করি। ভারতে পর্যটন বা বিনোদন কেন্দ্র অনেক রয়েছে। কাশ্মীর থেকে, মুসৌরী, সিমলা, কুলু, মানালি, নৈনিতাল, দার্জিলিং প্রভৃতি ছাড়াও রয়েছে কাজিরাঙ্গা, ডুয়ার্স, মধ্যপ্রদেশের বহু স্থান, গুজরাটের গির, গোয়ার সমুদ্র সৈকত আছে কন্যাকুমারী, পুরী, দীঘা, মন্দারমণি, বকখালি প্রভৃতি স্থান, তখন আন্দামান-নিকোবরকে পুণ্যভূমি বা তীর্থক্ষেত্র বিশেষ করে সেলুলার জেলকে তীর্থক্ষেত্র হিসেবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাটা কি যথাযথ হবে না?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, চন্দননগর।

ছিন্ন হোক মিথ্যা অপপ্রচার চক্রান্তের জাল

কুন্তল চক্রবর্তী

সত্যের জয় হবে। সাজানো অভিযোগকে ভয় পান না রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে যে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে সেই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে রাজ্যবাসী সন্দিহান। অতীতে এক সময় কোনো একজন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে এই অভিযোগ করে রাজ্যের তৎকালীন বিরোধী নেত্রী বর্তমানে হীরক রানি রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই অভিযোগ ভুয়ো তা প্রমাণিত হয়েছিল।

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, রাজ্যপালের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি এই ধরনের কাজ করতে পারেন কিনা? যদিও সবটাই সম্ভবনার মধ্যে থাকে তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি অতীতে কোনো রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ ওঠেনি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি এবং অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস প্রথম থেকেই সোচ্চার হওয়ার জন্য রাজ্যের শাসকদলের চোখের বালি। সিভি আনন্দ বোস অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে কোনো মূল্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি আপোশহীন লড়াই চালিয়ে যাবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে মহিলা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তার অভিযোগের সত্যতা কতটুকু। এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য বা তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা রাখা বা ভরসা রাখা কখনোই উচিত নয়। যদিও রাজ্য পুলিশ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আট সদস্যের একটি টিমও গঠন করে ফেলেছে।

কয়লা, বালি, গোরু, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে সর্বস্তরে নিয়োগ দুর্নীতিতে তৃণমূল এখন জর্জরিত। তার উপর সন্দেশখালিতে শেখ শাজাহানের নেতৃত্বে যেভাবে দিনের পর দিন মাতৃজাতির অমর্যাদা করা হয়েছে, মাতৃজাতির সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে সন্দেশখালির মানুষের সঙ্গে রাজ্যের মানুষও ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ নিয়েছে ২০২৪-এর সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে যে কোনো মূল্যে তৃণমূলের জামানত জব্দ করতে হবে। এই সম্ভাবনা লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিন বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাব্যতায় পরিণত হতে তৃণমূল চোখে সর্ষের ফুল দেখছে। সন্দেশখালি ঘটনা এবং রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে চলেছে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য মানুষের নজরকেঅন্যদিকে ঘোরানোর জন্য রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এইরকম একটি ঘৃণিত রাজনৈতিক চক্রান্ত তৈরি করা হয়নি তো?

এর উত্তর পাবার জন্য বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। যদিও রাজ্যপালের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ আছে তবুও রাজ্যের মানুষ দাবি রাখছে অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত তদন্তের নিষ্পত্তির।

অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে সারা দেশের মানুষ লজ্জিত হবে, পাশাপাশি অভিযোগ যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় তাহলে অভিযোগকারী এবং তার সঙ্গে যুক্ত সকলকে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, সিভি আনন্দ বোস রাজ্যের রাজ্যপাল। রাজ্যের সাংবিধানিক রক্ষাকর্তা। তার বিরুদ্ধে যদি ভ্রান্ত পরিকল্পনামাফিক রাজনৈতিক ঘৃণিত চক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে তা আগামীদিনের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ংকর। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন যে, অবিলম্বে এই অভিযোগের নিষ্পত্তি প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতি থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত রাজ্যের বুকে চক্রান্তের জাল তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি প্রশ্ন থাকছে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হয়েছে সেই চক্রান্তের সঙ্গে বৈদেশিক শত্রুর কোনো যোগাযোগ নেই তো?

সবকিছু সম্ভাব্যতার শিল্প হলেও যদি এই অভিযোগ মিথ্যা হয় তাহলে অভিযোগকারিণী-সহ নেপথ্য শিল্পী-পরিচালক এবং প্রযোজককে চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়'— তাই বলে পিঠে তৈরি করবার জন্য রাত বারোটার সময় যে চাওয়া শেখ শাজাহান সন্দেশখালির মাটিতে নামিয়ে নিয়েছিল এখন এই রাজ্যের মানুষ তৃণমূলকে বোঝাতে চাইছে পেটে খেলে পিঠে সয়। কিন্তু পিঠে খেলে পেটে সয় না।

আশা রাখি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সমস্ত চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে প্রমাণ করে দেবেন তিনি যুদ্ধে না গেলেও সব সময় যোদ্ধার বেশেই থাকেন।

পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতিতে জীবন হবে মধুর

মৌ চৌধুরী

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় একসঙ্গে হাঁটার ফলে তিন মাঝ বয়সি মহিলা কাকলি, রত্না ও রেবার পরিচয় এবং ক্রমেই সখ্য। একদিন রাতে কাকলি খুব উত্তেজিত ও উদ্বেগের স্বরে রত্নাকে ফোন করে বললেন, রেবা হঠাৎই হার্টঅ্যাটাকে মারা গেছেন। খবরটা এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে রত্নার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হয়নি। রত্না ভাবছিলেন, এই তো সেদিন মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন স্বামীহারা রেবা। মূলত চিকিৎসা করাতেই গিয়েছিলেন। বাড়িতে দুই ছেলে ও দুই ছেলের বউ থাকলেও তার দিকে নজর রাখার কেউ নেই। ঘরের কাজ সবই তাঁকেই করতে হয়। রেবার প্রেশার ছিল, সঙ্গে আরও অনেক শারীরিক সমস্যা। রত্না ভাবছিলেন, এখনকার প্রজন্মের কাছে সম্পর্কটাই ঠুনকো।

আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের ভাঙন খুব চিন্তার বিষয়। কোনো পরিবারই যেন সুখী নয়। পারিবারিক সম্পর্কগুলোর টান আলগা হওয়ার কারণে ট্রেস, টেনশন, মেজাজ হারানো রোজকার বিষয়। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই পারিবারিক বা আত্মীয়তার সম্পর্ককে মান্যতা দেয় না। বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা বা দায়িত্ব এখন ইতিহাস।

বেশিরভাগ পরিবারে এখন একটি বা দুটি সন্তান। স্কুলে পা দেবার সময় থেকেই 'কেরিয়ার' ও 'ভবিষ্যৎ' দুটিশব্দ তার মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়। তারই ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, সন্তানরা বড়ো হয়ে চাকরির জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। পাখি যেমন তার ছানাকে বড়ো করে ডানা মেলে আকাশে উড়তে শিখিয়ে দেয়, তেমনই মা-বাবা তাদের সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে পরিবার ছেড়ে অন্যত্র হারিয়ে যেতে দেয়। তার কারণেই টান হারিয়ে ফেলে ছেলেরা আর মা-বাবার দায়িত্ব নিতে চায় না। আর মেয়েরা একটু বড়ো হতেই স্বেচ্ছাচারী। তাদের অশালীন পোশাক, নেশা করা নিত্যদিনের ঘটনা। সন্তানদের আচরণ নিয়ে মা-বাবার কোনো চিন্তাভাবনা আছে কিনা সন্দেহ। পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়েও তারা সিরিয়াস নয়।

আবার সন্তানের বিয়ের পর দুটি পরিবারের মধ্যে কোনো আন্তরিক সম্পর্কও গড়ে উঠছে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছেলে-মেয়েরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী জীবনসঙ্গিনী বা সঙ্গী পায় না। এছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের সীমাহীন লোভ সম্পর্কের টানাপোড়েন বাড়িয়ে তোলে। মানিয়ে চলা তো দূরের কথা, পরস্পর কতটা অসহিষ্ণু হতে পারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলে। এর রেশ এসে পড়ে তাদের সন্তান এবং মা-বাবার ওপর। তাদের মন মানসিকতা কোন পর্যায়ে চলে যায় তা বিভিন্ন পরিবারে একটু চোখ রাখলেই তা বোঝা যায়। মা-বাবার সঙ্গে ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক, শাশুড়ি-পুত্রবধূর সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন যেন অসুস্থতার পর্যায়ে চলে গেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে সম্পর্কগুলোর মর্যাদা কিছুই বহন করে না। বিভিন্ন পরিবারে দাদু-দিদা, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, কাকা-জ্যাঠা-পিসি, মাসি- মামা-মামি এখন দূরতম গ্রহের বাসিন্দা। এখন পরিবারে মা তার সন্তানকে এমনভাবে শেখাচ্ছেন, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা হলেন বাবার বাবা ও মা এবং জ্যেঠা আর কাকা বাবার ভাই, সেই সন্তানের যেন কেউ নয়। তুলনায় আপন হলেন দাদু-দিদা, মাসি-মামা-মামি।

মানুষ সামাজিক জীব কিন্তু সমাজের এই পরিবর্তন এখন ফ্ল্যাট কালচারে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক মেয়ে বিয়ের পরদিনই শ্বশুড়বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আলাদা থাকা, নিত্যনতুন জিনিস কেনা, রান্নাঘরে তালা দিয়ে বাইরে খাওয়া— এটিই এখন সংস্কৃতি ও আধুনিকতা। যৌথ পরিবারের আনন্দ এখন আর কেউ নিতেই পারছে না।

সবচাইতে বেশি সম্পর্কের টানাপোড়েন চলে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর মধ্যে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুত্রবধূ তার মায়ের ইন্ধনে প্রতিনিয়ত শাশুড়িকে অপমান করে চলে। এই ফলে প্রতিটি সংসারে বাড়ছে অশান্তি, টেনশন, মানসিক অবসাদ, সুগার- প্রেশার-স্নায়ুরোগ। তারফলে পরিবারে পরিবারে অসুস্থতার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে কিন্তু সহজেই বেরিয়ে আসা যায়। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষকে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়। যুগে যুগে অর্থ উপার্জনের পথ হয়তো ভিন্ন হয়েছে, কিন্তু সম্পর্কগুলো বড়োই মধুর ছিল। সেই সম্পর্ককে আমরা সহজেই ফিরিয়ে আনতে পারি। এই কর্মব্যস্ততার দিনেও সময় পেলেই পরিবারের সদস্যদের সময় দেওয়া, বুদ্ধির সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা, যতটা সম্ভব সকলের প্রতি সম্মান দেখানে ইত্যাদি করা যেতেই পারে।

এভাবে পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি হলে সমাজে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বেই। সবাই এগিয়ে এলে আগামী প্রজন্মের মধ্যে ইতিবাচক ভাবনার উন্মেষ ঘটবে, আর তাহলেই পারিবারিক ও সামাজিক জীবন মধুর হবে। একটাই তো জীবন। সেই জীবন একটু আনন্দময় করে নিতে পারলে নিজে ভালো থাকা যায়, অন্যকেও ভালো রাখা যায়।

মাল্টিপল্ মায়েলোমার (ব্লাড ক্যানসারের) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ব্লাড ক্যানসার বিভিন্ন ধরনের হয়। তারই একটি হলো মাল্টিপল্ মায়েলোমা। মানুষের অস্থিমজ্জায় প্লাজমা কোষ যখন অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বেড়ে চলে তখন এই রোগ দেখা দেয়। এর ফলে শরীরের একাধিক অঙ্গ প্রভাবিত হয়। সেই সূত্রেই মায়েলোমা অসুখটির সঙ্গে মাল্টিপল্ কথাটি যোগ করা হয়েছে। রোগটি কীভাবে বা কেন হয়, সেই বিষয়ে এখনও ঠিকভাবে কিছু জানা না গেলেও এই ক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তনের (জেনেটিক মিউটেশন) একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। মাল্টিপল্ মায়েলোমা বয়সকালীন রোগ, ষাট বা পঁয়ষট্টি বছরের উপরে মহিলা বা পুরুষ, যে কোনো হতে পারে। তবে অল্পবয়সে যে এই রোগ হয় না, তা নয়, যদিও তা খুবই বিরল।

লক্ষণ : মাল্টিপল্ মায়েলোমায় দু-তিনটি লক্ষণ সাধারণত দেখা যায়— ক্লান্তিভাব, রক্তাল্পতা, হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমতে থাকা। অনেক সময়েই রক্তাল্পতার কারণে সাধারণ মানুষ কুলেখাড়ার রস ও ওভার দ্য কাউন্টার 'আয়রন ট্যাবলেট' কিনে এনে খান। কিন্তু সব অ্যানিমিয়া যে রক্তে আয়রনের মাত্রা কমের কারণে হয় না, এই বিষয়টিও মাথায় রাখা প্রয়োজন। বিশেষত মায়েলোমার মতো অসুখের ক্ষেত্রে যেখানে রক্তাল্পতাই অন্যতম লক্ষণ। কোমরে, শিরদাঁড়ার আশপাশে এমনকী পাঁজরের দিকেও ব্যথা হয়, হাত পা, ঝিনঝিন করে।

মায়েলোমার রোগী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার' হয়। সাধারণত খুব বড়ো কোনও আঘাত বা দুর্ঘটনার ফলে মানুষের হাড় ভেঙে যায়। কিন্তু মায়েলোমার ক্ষেত্রে সাধারণ চাপেই রোগীর শরীরের হাড় ভাঙতে পারে। এছাড়া বারবার সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত, কিডনির মধ্য দিয়ে যে প্রোটিনগুলি আমাদের শরীর থেকে ছেঁকে বের হয়, সেগুলি এক্ষেত্রে সরাসরি কিডনিতে নেতিবাচক ভাবে প্রভাব ফেলে। তার ফলেই বাড়ে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা। তাই মায়েলোমাতে যে দুটি অঙ্গ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়— হাড় ও কিডনি। কিন্তু সচেতনতার অভাবে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা করান না বলে, রোগীদের অনেকেরই খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই লক্ষণগুলির পাশাপাশি কারও কারও ক্ষেত্রে অযথা ব্লিডিং বা থ্রম্বোসিস-ও হয়ে থাকে।

রোগ নির্ণয় : এই রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রথমেই কিছু রক্ত পরীক্ষা ও বোনম্যারো টেস্ট করা হয়। এই পরীক্ষায় যদি প্লাজমাকোষ দশ শতাংশের বেশি থাকে অথবা টিসু

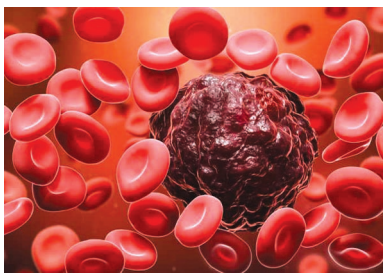

বায়োপসি করে যদি প্লাজমা কোষের ক্লাস্টার পাওয়া যায়, তাহলে প্রাথমিক ভাবে ধরে নেওয়া হয়, রোগীর মাল্টিপল্ মায়েলোমা হয়েছে। এরপরে সিআরএবি বা ক্র্যাগ ক্রাইটিরিয়ার কোনও একটিও পজিটিভ হলে নিশ্চিত ভাবে ধরে নেওয়া হয় ওই ব্যক্তির মাল্টিপল্ মায়োলোমার বিষয়টি। প্রসঙ্গত ক্র্যাব (CRAB) ক্রাইটিরিয়ায় প্রত্যেকটি বর্ণের একটি অর্থ রয়েছে। যেমন সি-হল ক্যালসিয়াম। মায়েলোমার রোগী হাইপার ক্যালসেমিয়ায় ভোগেন, অর্থাৎ শরীরে ক্যালসিয়াম বেশি থাকে। 'আর' হলো রেনাল ডিস্ফাঙ্কশন, অর্থাৎ ক্রিয়েটিনিন বেশি। 'এ' হলো অ্যানিমিয়া এবং 'বি' হলো কোনইনভল্মেন্ট হাড়ের রোগ। এক্ষেত্রে হাড়ে ছিদ্র হওয়ার ফলে হাড়গুলি ক্ষয়ে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সামান্য চাপেও তা ভেঙে যায়। এটাই হলো প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার।

এর সঙ্গে কিছু রুটিন রক্ত পরীক্ষাও থাকে। মাল্টিপল্ মায়েলোমার ক্ষেত্রে লিভার ফাংশন টেস্টের (এলএফটি) বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই পরীক্ষায় একটি অংশে টোটাল প্রোটিন মাপা হয়। এই টোটাল প্রোটিনের একটি অংশ হলো অ্যালবুমিন, অন্যটি গ্লোবিউলিন। সাধারণ ক্ষেত্রে অ্যালবুমিন থাকে বেশি এবং গ্লোবিউলিন কম। মায়েলোমায় যেহেতু প্লাজমা কোষ এক ধরনের গ্লোবিউলিন নিঃসরণ করে তাই এলএফটি-তে টোটাল প্রোটিনে অ্যালবুমিন-গ্লোবিউলিন-এর হার পালটে যায়। এই বিষয়টি আগে থেকে মাথায় রাখা হলে মাল্টিপল্ মায়েলোমা নির্ণয় করতে সুবিধা হয়। এছাড়াও, প্রতিটি ক্ষেত্রে ইমিউনোফিক্সেশন ইলেকট্রোফোরেসিস, প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস, সেরাম ফ্রি লাইট চেন রেশিয়োর মতো মায়েলোমা স্পেসিফিক পরীক্ষাও করা হয়ে থাকে।

তবে শুধু পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করলেই চলে না। জানতে হয় রোগ কী মাত্রায় রয়েছে। ফুসফুস বা কোলনে ক্যানসারের মতো সলিড টিউমারের ক্ষেত্রে যেখানে রোগের মাত্রা প্রাইমারি বা টার্মিনাল হিসেবে ধরা হয়, সেখানে লিউকেমিয়া বা মায়েলোমার মতো লিকুইড বা ডিফিউজড্ টিউমারের ক্ষেত্রে তা স্ট্যান্ডার্ড, হাইরিস্ক বা আলট্রা হাই রিস্ক হিসেবে মাপা হয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতার উপর নির্ভর করে দেওয়া হয়। আমার ৩৭ বছরের চিকিৎসা জীবনে এমন অনেক ক্যানসার রোগীকে অনেক বছর ধরে ভালো রেখেছি। কেউ কেউ আরোগ্য লাভও করেছে।

প্রথম অবস্থায় : ১. থুজা, ২. নেট্রাম সালফ্, ৩. ক্যালকেরিয়া ফস, ৪. ম্যাঙ্গানাম অ্যাসেটিকাম, ৫. ওলিয়াম সুমিনিয়ন রেক্টিফিকেটাম দ্বিতীয় অবস্থায় : ১. ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা, ২. পিকরিক অ্যাসিড, ৩. অ্যারানিয়া ডায়াডেমা, ৪. মেনিস্পারমাম, ৫. সেনোথাস অ্যামেরিকানাস। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যক্তি বিশেষের জন্য ওষুধ নির্বাচন করে তবেই দেন।

যখনই হিন্দুদের উপর আক্রমণ এসেছে, তখনই মহারাজ বীর বিক্রমে রুখে দাঁড়িছেন। প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছেন। ধর্মীয় কারণে উৎপীড়িতদের কাছে তিনি এক বিশাল বল ভরসা। এমন ব্যক্তি জেহাদিদের চক্ষুশূল হবে এটা বলাই বাহুল্য।

রাজনৈতিক আক্রমণের শিকার স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী

মন্দার গোস্বামী

সময়টা ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর, প্রবল বন্যায় বিপর্যস্ত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম-সহ পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অংশ। রেল, সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল তো বটেই এমনকী শহরাঞ্চলের জনজীবনও ভীষণভাবে বিপর্যস্ত। চারিদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সহ খাদ্যের তীব্র হাহাকার। সবচেয়ে করুণ অবস্থা পদ্মা নদীর চরগুলির বাসিন্দাদের। প্রবল বর্ষণে ফুলে ফেঁপে ওঠা ভয়াল, প্রমত্তা পদ্মার বাসিন্দারা অভুক্ত অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। পরিস্থিতি এমন যে, প্রশাসনও সেখানে পৌঁছাতে পারেনি। এই অবস্থায় এগিয়ে এলেন এক সন্ন্যাসী। খাদ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, ওষুধপত্র সংগ্রহ করে একদল সেবককে সঙ্গে নিয়ে তিনি পদ্মা পাড়ি দিলেন প্রবল বর্ষণ সঙ্গে। ঝড়ে নৌকা প্রায় উলটে যাওয়ার উপক্রম। প্রাণে বাঁচতে অনেকেই ফিরে আসার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু অকুতোভয় সেই সন্ন্যাসী ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে পৌঁছে গেলেন চরগুলিতে। পৌঁছে দিলেন খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধপত্র, ত্রিপল-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শুধু তাই নয়, জলঙ্গির প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে স্থাপন করলেন সেবাকেন্দ্র।

শুরু হলো বন্যা দুর্গতদের মধ্যে সেবাকাজ। দুর্গত ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সেদিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ১৯৯৩-এর ৯ এপ্রিল প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ কান্দি মহকুমার গোকর্ণ, খোসবাসপুর, চাতরা-সহ আরও তিনটি গ্রাম। সরকারি হিসেবেই মৃতের সংখ্যা ৬০। তখনও এগিয়ে এসেছিলেন এই সন্ন্যাসী। মুহূর্ত মাত্র কালক্ষেপ না করে বিপর্যস্ত গ্রামগুলিতে খোলা হলো লঙ্গরখানা, অসহায়দের কাছে পৌঁছে দিলেন ওষুধপত্র-সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। দীর্ঘদিন ধরে বিপর্যয় স্থলে থেকে নেতৃত্ব দিলেন গ্রাম পুনর্গঠনের। হ্যাঁ, ইনিই বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী ওরফে কার্তিক মহারাজ। সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে জানতে নেই। তবুও যেটুকু জানা গেছে ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ডাকাবুকো। লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলায় পারদর্শী। হিন্দু সমাজের অবক্ষয় রোধে ভারত সেবাশ্রম

সঙ্ঘের অগ্রণী ভূমিকায় প্রভাবিত হয়ে তিনি সঙ্ঘের সন্ন্যাসী হওয়ার সংকল্প নিলেন। তখন তার বয়স মাত্র সতেরো বা আঠারো।

প্রথমে এলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পুরুলিয়া শাখায়। কিছুদিন সেখানে সেবক ছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে অন্ন সংস্থান করতে হতো। সেখান থেকে এলেন মুর্শিদাবাদ জেলার ঔরঙ্গাবাদ শাখায়। সেখানে তখন অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ, তাঁর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী জীবনে উত্তরণের চারটি সংস্কার আবশ্যিক— উপনয়ন সংস্কার, ব্রহ্মচর্য সংস্কার, গৈরিক সংস্কার এবং তারপর সন্ন্যাস। দু' এক বছর পর তিনি শ্রদ্ধেয় স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর সান্নিধ্যে ব্রহ্মচর্য সংস্কার গ্রহণ করেন। এই জীবন খুবই কঠোর। একবেলা আহার, মাটিতে শয়ন, কৃচ্ছ সাধন। সারাদিন ভিক্ষার মাধ্যমে অন্ন সংস্থান। কার্তিক মহারাজ সম্পর্কে একটি প্রবাদ রয়েছে তিনি কখনও খালি হাতে ফিরতেন না। পেঁপে, কলা সামান্য মুলো যা পেতেন তাই ভিক্ষা নিয়ে আসতেন। আশ্রমে কিছু বই ছিল। অবসর সময়ে তিনি আধ্যাত্মিক পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতেন। হিরন্ময়ানন্দজী প্রখর বাগ্মী ছিলেন, তাঁর সান্নিধ্যে কার্তিক মহারাজও ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন। গৈরিক সংস্কারের পর সঙ্ঘের বালিগঞ্জ শাখায় মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে বিরজা হোম ক্রিয়ার মাধ্যমে (আত্মশ্রাদ্ধ ক্রিয়া) সন্ন্যাসে দীক্ষিত হন।

এরপর তাকে কঠিন লক্ষ্য দেওয়া হলো। আশির দশকের মাঝামাঝি তাঁকে পাঠানো হলো মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বেলডাঙ্গায়। এখন যেখানে আশ্রম, সেখানে তখন কোনো পাকা বাড়ি ছিল না। ছিল মাত্র একটি টিনের চালা, কয়েকটি গোরু। মাত্র এটুকু সম্বল করেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী একের পর এক জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। পৌঁছে গেলেন সমাজের অসহায়, দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের পাশে। সেবাকাজে তিনি জাত ধর্মের কোনও ফারাক করতেন না। আর্থিক দুরবস্থার কারণে যেসব শিশু শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত, বিশেষ করে শিশু শ্রমিকদের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন শিক্ষা কেন্দ্র। এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা, ঔরঙ্গাবাদ, ফরাক্কা ও জলঙ্গি-সহ অন্যান্য অঞ্চলে আটটি প্রাথমিক বিদ্যালয়-সহ চারটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সাফল্যের সঙ্গে চলছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় আট হাজার। এদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী। পিছিয়ে থাকা সমাজের বিশেষ করে জনজাতি সমাজের শিক্ষার মান উন্নয়নে জেলায় তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় থেকেই এক ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করেছিল।

বেলডাঙ্গায় একটি ছাত্রাবাস রয়েছে। সেখানে প্রায় সাড়ে চারশো ছাত্র থাকে। চাণকে রয়েছে ছাত্রী আবাস। পড়াশোনা ছাড়াও তাদের সেলাই-সহ নানা কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাল্যবিবাহ রোধ-সহ অন্যান্য অন্ধবিশ্বাস প্রতিরোধে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিনামূল্যে দরিদ্রদের কাছে চিকিৎসা পৌঁছে দিতে মূলত তাঁর আগ্রহেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুটি হাসপাতাল। একটি মুর্শিদাবাদের চাণকে, অপরটি বেলডাঙ্গা আশ্রমে। রয়েছে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসার ব্যবস্থা। স্বামী প্রণবানন্দজী বলেছিলেন, 'আমি হিন্দুকে হিন্দু নামে ডাকতে চাই' এই উপদেশকে পাথেয় করে স্বামীজী মূলত ভিক্ষার মাধ্যমে বেলডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠা করেছেন এক ভব্য হিন্দু মিলন মন্দির। এটি শুধুমাত্র একটি উপাসনার স্থল নয়, সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রও বটে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'হিন্দু সমাজ থেকে একজন চলে যাওয়া মানে শুধু একজন হিন্দু কমে যাওয়া নয় একজন শত্রুও বৃদ্ধি হওয়া।' বল প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভনের কারণে একসময় যারা হিন্দু সমাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদের পুনরায় আশ্রমে যাগযজ্ঞের মাধ্যমে সাদরে হিন্দু সমাজে বরণ করে নেওয়া হয়। লাভ জেহাদের ফাঁদে পড়ে যেসব তরুণী পথভ্রষ্ট হয়ে চরম দুর্দশায় পড়ে, তাদেরকে স্বামীজী পরম মমতায় কাছে টেনে নেন। তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। তাদের পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে আনেন। বেলডাঙায় হিন্দু ধর্মীয় শোভাযাত্রায় জেহাদি আক্রমণ একসময় নিয়ম হয়ে উঠেছিল। মহারাজের দৃঢ় সাহসিক নেতৃত্বে আজ তা অনেকটাই কমে গিয়েছে।

তবুও যেখানে যখনই হিন্দুদের উপর আক্রমণ এসেছে, তখনই মহারাজ বীর বিক্রমে রুখে দাঁড়িয়েছেন। প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছেন। ধর্মীয় কারণে উৎপীড়িতদের কাছে তিনি এক বিশাল বল ভরসা। এমন ব্যক্তি জেহাদিদের চক্ষুশূল হবে এটা বলাই বাহুল্য। এক সময় জেহাদিরা তার মাথার দাম ঘোষণা করেছে। তিনি বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু যিনি নিজের শ্রাদ্ধ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন তার আর কীসের প্রাণের ভয়? সনাতন সংস্কৃতির প্রসারে তার অবদান উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণীতে ৭০০ বছর আগে লুপ্ত কুম্ভ মেলার পুনরায়োজনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁর মাধ্যমেই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা সাধারণ সমাজ জীবনে অবশ্য পাঠ্য হয়ে উঠেছে। ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে অথবা মুর্শিদাবাদের ফরাসডাঙ্গায় পঞ্চাশ হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠের সফল আয়োজনের মাধ্যমে তিনি গীতা সাধনার নতুন একটি দিক উন্মোচিত করেছেন। তোষণনীতির রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই আজ তিনি চক্ষুশূল। তাই তারা আজ তাঁকে আক্রমণ করছেন। আক্রমণ করছেন সনাতন সংস্কৃতিকে। আক্রমণ করেছেন স্বয়ং এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। দুধেল গাইদের ভোটের যে বড্ড প্রয়োজন। কিন্তু কথায় আছে না— 'হাতি যায় বাজার/কুত্তা ভোঁকে হাজার।' সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সেবার মূর্ত প্রতীক এই সন্ন্যাসী মানুষটি অবিচল লক্ষ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। কোনো অক্রমণই তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। হতশ্রী এই পশ্চিমবঙ্গের দুর্দিনে আজ কার্তিক মহারাজের নেতৃত্ব, দিশা নির্দেশ বড়োই প্রয়োজন। ■

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

সন্তদের অপমান সইবে না হিন্দুস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১৮ মে লোকসভা ভোটপ্রচারে গোঘাটের একটি নির্বাচনী জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের নাম উল্লেখ করে বলেন— 'ওঁকে আমি সাধু মনে করি না। সব সাধু— সাধু নয়, প্রদীপ্তানন্দজী দাঙ্গার হোতা। উনি (কার্তিক মহারাজ) বলেছেন, ভোটের দিন বুথে তৃণমূলের কোনো এজেন্টকে বসতে দেব না।' এগুলো ছিল সম্পূর্ণ ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর মনগড়া কথা। এর জন্য আইনি চিঠি পাঠিয়ে তাঁর কাছে প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। ওই সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকন, রামকৃষ্ণ মিশনের সব সাধুকে আমি সাধু মনে করি না, তারা দেশের সর্বনাশ করছে।' তাঁর এই বিদ্বেষ ও প্ররোচনা মূলক বক্তব্যের পরেই শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর চলে দুষ্কৃতী হামলা।

সম্প্রতি ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের সাম্প্রদায়িক, বিদ্বেষমূলক, হিংসাত্মক মন্তব্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। হুমায়ুন কবির বলেছিলেন, 'হিন্দুরা এখানে ৩০ শতাংশ। এই ৩০ শতাংশকে আমরা কেটে ভাগীরথী নদীতে ভাসিয়ে দিতে পারি'। এই হিংসাত্মক মন্তব্যের পরেও হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি মুখ্যমন্ত্রী। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকনের ওপর মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর দল ও প্রশাসনের সম্মিলিত আক্রমণ ও ভাষা সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বঙ্গীয় সন্ন্যাসী সমাজের উদ্যোগে গত ২৪ মে, শুক্রবার বিকাল ৩টায় কলকাতায় বাগবাজার নিবেদিতা পার্কে প্রথমে সন্ত সমাগম এবং তারপরে বিকাল ৪টায় বাগবাজার মায়ের বাড়ি থেকে স্বামীজীর জন্মভিটা পর্যন্ত 'বিরাট সন্ত স্বাভিমান যাত্রা' আয়োজিত হয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ভক্ত-শিষ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হিন্দুর সর্বজন পূজ্য শ্রীমৎ কার্তিক মহারাজের (স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী) বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর এই বিষোদ্গারের তীব্র প্রতিবাদ জানায় বঙ্গীয় সন্ন্যাসী সমাজ। শতাধিক বছরের ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক সংগঠন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশ ও দশের সেবায় নিয়োজিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেবাকাজ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, হাসপাতাল নির্মাণ, স্কুল পরিচালনা ইত্যাদির মাধ্যমে এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘ দেশ ও জাতির উন্নয়নে আত্মোৎসর্গ করেছে।

যে সন্ন্যাসীরা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' — এই মন্ত্রে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই সন্ন্যাসী ও সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে অপমান করেছেন তার প্রতিবাদে গিরিশ অ্যাভিনিউ, বাগবাজার স্ট্রিট, শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়, বিধান সরণির পথ ধরে পূজ্য সাধুসন্তরা খালি পায়ে এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। যাত্রাপথে অগণিত ভক্ত এই ভব্য সন্ত যাত্রাকে দর্শন, আরতি ও সংবর্ধনা জানাতে থাকেন। বঙ্গীয় সন্ন্যাসী সমাজের তরফে শ্রীমৎ সর্বানন্দ অবধূত বলেন, 'সাধু সমাজের অপমান মানে সমগ্র মানব জাতির অপমান। মুখ্যমন্ত্রীর এই অপমান ও কুৎসিত ভাষা সমগ্র হিন্দু সমাজকে আহত ও ব্যথিত করেছে। হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলের এহেন আচরণ হিন্দু সমাজ কখনোই মেনে নেবে না। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করছি আপনি সাধুসন্ত ও সনাতন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন না। সনাতন ধর্মবিরোধী, অপমানজনক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন'।

গত ২৪ মে বিকালে সাধুসন্তদের এক ঐতিহাসিক শোভাযাত্রার সাক্ষী থাকল কলকাতা। মুখ্যমন্ত্রীর অপমানজনক মন্তব্যের প্রতিবাদ স্বরূপ এদিন পথে নামে পশ্চিমবঙ্গের সাধু সমাজ। 'সন্ত স্বাভিমান যাত্রা'য় অংশ নেওয়া সাধুরা তৃণমূলনেত্রীর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে বলেন। কলকাতার রাস্তায় বিশাল সংখ্যক প্রতিবাদী সাধুসন্ত, সন্ন্যাসিনী-মাতাজী, তাঁদের ভক্ত-শিষ্য ও অসংখ্য হিন্দুর এই শোভাযাত্রা সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিছিলের সাক্ষী হলেও সাধুসন্তদের এই ধরনের প্রতিবাদী যাত্রা আগে কোনো দিন দেখা যায়নি বলেও অনেকেই জানান। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী পরমাত্মানন্দ ভৈরবগিরি মহারাজ, স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ সর্বানন্দ অবধূত, শ্রীপাদ জগদার্তিহা দাস, স্বামী গুরুপদানন্দজী মহারাজ, খনা মা প্রমুখ।

তাঁদের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের নানা সম্প্রদায় ও পরম্পরার সাধু ও ভক্তদের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিকাল ৪টেয় শুরু হয়ে বাগবাজারে মা সারদার বাড়ি থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটে সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত যায়। 'সন্ত স্বাভিমান যাত্রা'য় যোগ দেওয়া অসংখ্য সাধুসন্ত খালি গায়ে ও খালি পায়ে

কয়েকমাসের শিশু কোলে স্বাভিমান যাত্রায় এক প্রতিবাদী মা।

খঞ্জনি আর শঙ্খ বাজাতে বাজাতে কলকাতা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান। সন্ন্যাসিনী-মাতাজীদের উপস্থিতিও ছিল বিপুল সংখ্যায়। তাঁদের শঙ্খধ্বনিতে মন্দ্রিত হয় কলকাতার আকাশ-বাতাস। সন্তসমাজের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া প্রভু জগদার্তিহা দাস বলেন, 'যেভাবে নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্তিক মহারাজের মতো এক মহান সাধুর নামে যে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের ভোটব্যাংক সুরক্ষিত রাখার জন্য তিনি যে মন্তব্য সাধুদের নামে করেছেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা চাই, এই মন্তব্যের জন্য অবিলম্বে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করুন। না হলে আগামীদিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের রাস্তায় হাঁটব'। প্রবীণ সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ বলেন, 'আমার সম্বন্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন। নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষকে খুশি করার জন্যই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাঁর মন্তব্যের জেরে সমস্ত সাধুর অপমান হয়েছে'।

রিষড়া প্রেম মন্দিরের স্বামী নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অখিল ভারত হিন্দু মিলন মন্দিরের মুখ্য সংগঠক স্বামী গুরুপদানন্দজী মহারাজ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকন, রামকৃষ্ণ মিশনের সব সাধুকে আমি সাধু মনে করি না, তারা দেশের সর্বনাশ করছে। কে সাধু, কে সাধু নয়— এই বিচার করার উনি কে? সাধুতার পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার তাঁকে কে দিয়েছে? কী যোগ্যতা আছে তাঁর সাধুতার বিচার করার? এই প্রথম নয়, উনি বার বারই হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিরূপ, কুরুচিকর, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও দাম্ভিক মন্তব্য করে থাকেন। এই মন্তব্যগুলি তাঁর স্বৈরাচারিতার প্রমাণ'। দুই প্রবীণ সন্ন্যাসী আরও বলেন, 'এই ধরনের মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র হিন্দু সমাজ, সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীর স্বাভিমানে আঘাত হানছেন। তাঁর এই বক্তব্যের পরেই শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে সশস্ত্র হামলা হলো। বিধায়ক হুমায়ুন কবির হুমকি দিয়ে বলেছেন, মুর্শিদাবাদে ৩০ শতাংশ হিন্দু আছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে খুন করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে পারি! এই পরিস্থিতিতে সাধু-সন্ন্যাসীরা এবং গ্রামের হিন্দু সমাজ, হিন্দু মা-বোনেরা আতঙ্কিত হয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বঙ্গীয় ইমাম পরিষদ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের সকলেই যেন তৃণমূলকে ভোট দেয়।

এইসব ব্যাপারে উনি (মুখ্যমন্ত্রী) সাম্প্রদায়িকতা দেখতে পান না! সর্বনাশের কারণ খুঁজে পান না! ভারতবর্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ। সর্বত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ্রসাধন, কঠোর তপস্যায় ভারতীয় সভ্যতা- সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছে। তাঁদের শিক্ষায় শুদ্ধ, পবিত্র, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ভারতীয় জীবন প্রণালী রচিত হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীদের তপঃশক্তি ভারতের আত্মশক্তি, ভারতের প্রাণশক্তি।

সাধু-সন্ন্যাসীদের ত্যাগ ও বৈরাগ্যই ভারতের সর্বজনীন আদর্শ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ও ইসকন— তিনটি প্রতিষ্ঠানই

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ আশ্রয়। আর্ত, পীড়িত, অসহায় মানুষের সেবায় যাঁরা সর্বক্ষণ নিয়োজিত, মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে স্বভাবসুলভ ভাষায় অপমানসূচক মন্তব্য করে হিন্দু সমাজ, সাধুসন্তদের আত্মসম্মানে, স্বাভিমানে আঘাত হেনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বঙ্গীয় সন্ন্যাসী সমাজের আহ্বানে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হিন্দু সমাজের যোগদান করা এই স্বাভিমান যাত্রা মুখ্যমন্ত্রীর কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানোর জন্য এই যাত্রা।

এই আহ্বানে সন্ন্যাসী সমাজের এই স্বাভিমান যাত্রার সঙ্গে শামিল হয়েছেন হাজার হাজার দেশপ্রেমিক, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক সব শ্রেণীর হিন্দু সমাজ। ভারত সরকারের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে আমরা হিন্দু সমাজ, সাধু সমাজের নিরাপত্তা বিধানের আবেদন জানাচ্ছি'। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে শোভাযাত্রা এসে উপস্থিত হলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তিতে মাল্যদান করেন সাধুসন্তরা। স্বামীজীর জন্মভিটায় (রামকৃষ্ণ মিশন-স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে) শোভাযাত্রা শেষ হয়। স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যদান ও স্বামীজীকে আরতি করেন সাধুসন্তরা। শোভাযাত্রা শেষে বক্তব্য রাখার সময় কার্তিক মহারাজ এই কঠিন সময়ে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার বিষয়ে বার বার গুরুত্ব আরোপ করেন। অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিষয়গুলিও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। শতবর্ষে পদার্পণ করা একজন প্রবীণ থেকে শুরু করে সদ্যোজাতকে কোলে নিয়ে একজন মা— সবার অংশগ্রহণে এই ঐতিহাসিক ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা যেন তুলে ধরলো আপামর বাঙ্গালির প্রতিবাদী সত্তার একটি সম্পূর্ণ চিত্র। তুলে ধরলো মনুস্মৃতি ও মহাভারত বর্ণিত 'ধর্ম রক্ষতি রক্ষতঃ' শীর্ষক মহান আদর্শের প্রতিফলন। আরও একবার প্রমাণ হলো যে এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বিকিয়ে গেলেও ধর্মের ওপর, গৈরিক বসনের ওপর আক্রমণ নেমে এলে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে প্রতিবাদ-মুখর হতে ভুলে যায়নি বাঙ্গালি সমাজ। কলকাতার পাশাপাশি এইদিন শিলিগুড়ি, বেলডাঙা, মহিষাদল ও কাকদ্বীপের বাসন্তী ময়দান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে শোভাযাত্রায় শামিল হন সাধুসন্ত ও অগণিত মানুষ। ■

উত্তর কলকাতার বাসিন্দা ১০০ বছর বয়সি সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী স্বাভিমান যাত্রায়

মালদহের গাজোলে সংস্কৃতভারতীর দশদিবসীয় আবাসিক সংস্কৃত বর্গ

মালদহ জেলার গাজোলের ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃতভারতীর দশদিবসীয় আবাসিক সংস্কৃত প্রবোধন বর্গ। গত ১২ মে বিকেলে বর্গের উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী বৈবস্বতানন্দ মহারাজ, গাজোলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিধান রায় এবং সংস্কৃতভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক সিদ্ধিনাথ পাঠক। বর্গে ৬৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

২০ মে বর্গের সমাপ্তি হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আশীর্বচন দান করেন স্বামী বৈবস্বানন্দ মহারাজ। সমাপ্তি ভাষণ দেন সংস্কৃতভারতীর ক্ষেত্রীয় সংযোজক প্রণব নন্দ। সর্বাধিকারী রূপে ছিলেন শ্রীকান্ত বৈদ্য। সর্বব্যবস্থা প্রমুখ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সংস্কৃতভারতীর মালদহ জেলা সংযোজিকা তাপসী মণ্ডল।

মেদিনীপুর নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা

মেদিনীপুর নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ১৯ মে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে ৩১ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রার্থনানন্দ মহারাজ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অঞ্জলি সিনহা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বজরংলাল আগরওয়ালা, ঈশ্বরীপ্রসাদ বাজোরিয়া ও মনোজ খাজাঞ্চি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ড. অনিল ঘোষ, ড. আশিস ঘোষ ও গৌরীশঙ্কর মাইতি, চিকিৎসক ডাঃ রবিশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং মেদিনীপুর নগর সঙ্ঘচালক মৃগাঙ্কশেখর মাইতি।

শ্রদ্ধেয় স্বামীজী কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে আশীর্বাণী প্রদান করেন। ট্রাস্টের সদস্য ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ (দ্বিতীয়)-এর শুভারম্ভ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাযকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়'র শুভারম্ভ গত ১৭ মে নাগপুরের রেশিমবাগস্থিত ডাঃ হেডগেওয়ার স্মৃতি মন্দিরের মহর্ষি ব্যাস সভাগৃহে হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বর্গের সর্বাধিকারী ইকবাল সিংহ, সহ সরকার্যবাহ কৃষ্ণগোপালজী এবং বর্গের পালক অধিকারী অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ পরাগ অভ্যঙ্করজী ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন দুজন সহ সরকার্যবাহ মুকুন্দজী এবং রামদত্ত চক্রধরজী। বর্গে সারা দেশ থেকে ৯৩৬ জন কার্যকর্তা শিক্ষার্থীরূপে বর্গে অংশগ্রহণ করেন। তারমধ্যে উত্তরবঙ্গের ২৯, মধ্যবঙ্গের ১৬ এবং দক্ষিণবঙ্গের ১৭ জন কার্যকর্তা রয়েছেন।

উদ্বোধনী ভাষণে পরাগ অভ্যঙ্করজী শিক্ষার্থী কার্যকর্তা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, নাগপুরে এসে সঙ্ঘকাজকে অনুভব করা এবং সঙ্ঘ সাধনার সৌভাগ্য প্রতিটি স্বয়ংসেবকের মনেই থাকে, কেননা এই ভূমি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ হেডগেওয়ার এবং শ্রীগুরুজীর তপোভূমি। সঙ্ঘকার্যে প্রশিক্ষণের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। এই কারণে কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্ত অনুসারে প্রশিক্ষণ বর্গ শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার আগে সঙ্ঘকাজে নানাপ্রকারের চ্যালেঞ্জ ছিল। স্বয়ংসেবকদের দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। স্বয়ং ডাক্তারজীকে জঙ্গল সত্যাগ্রহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। সঙ্ঘের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকার সময় এবং করোনাকাল ছাড়া সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ বর্গ কখনো বন্ধ হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণ বর্গকে সময়োপযোগী করা হয়েছে। কার্যকর্তাদের চিন্তাভাবনা কেমন হওয়া উচিত, তাদের সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ, এইসব বিষয় মাথায় রেখে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যেও বদল করা হয়েছে। আগে শারীরিক কার্যক্রমে ধৈর্য ও সাহস বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হতো। এখন পরিস্থিতি বদল হয়েছে। নিত্যনতুন সৃষ্টি করা ন্যারেটিভকে বুঝতে হবে। তারজন্য প্রশিক্ষণ বর্গে সেভাবেই বিষয়ের সমাবেশ করা হয়েছে। সংগঠিত হিন্দু সমাজের বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ নির্মাণের জন্য বর্গের বিষয় রচনা করা হয়েছে। সমাজের সজ্জন শক্তির সহায়তায় সঙ্ঘকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তারও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এই বর্গে শিক্ষার্থীরা পাবেন। সারা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এই বর্গে এসেছেন, তার ফলে রাষ্ট্রীয় একাত্মতার ভাব বৃদ্ধি পাবে, হিন্দুত্বের একতার অনুভূতিও হবে।

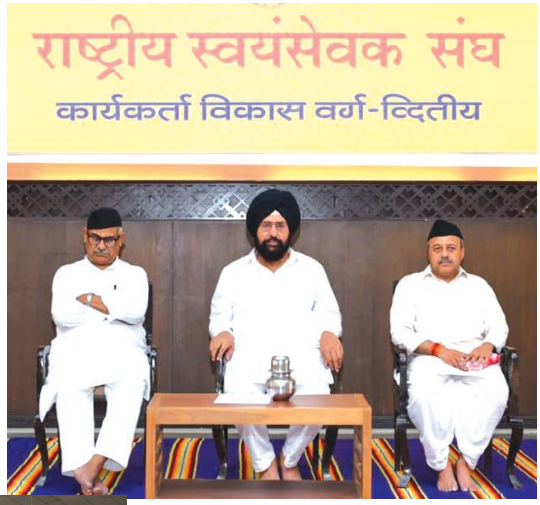

বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে আগামী ১০ জুন। উত্তরবঙ্গের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ শুরু হয়েছে গত ১৭ মে, রায়গঞ্জে সারদা বিদ্যা মন্দির (বাংলামাধ্যম) পরিসরে। ২০৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। বর্গের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ প্রদান করেন রায়গঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ। স্বাগত বৌদ্ধিক রাখেন প্রান্ত সঙ্ঘচালক হৃষীকেশ সাহা। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের অস্থি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সোমব্রত ঘোষাল। বর্গে সর্বাধিকারী রূপে রয়েছেন শিলিগুড়ি বিভাগ সঙ্ঘচালক উমেশচন্দ্র বর্মন এবং বর্গ কার্যবাহ রূপে রয়েছেন মালদা বিভাগ কার্যবাহ শ্যামল পাল।

দক্ষিণবঙ্গের আন্দামান বিভাগের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ (সাধারণ) গত ৪ মে শুরু হয়ে ২০ মে সমাপ্ত হয়েছে। ৬৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। সর্বাধিকারী রূপে ছিলেন কলকাতা উত্তর ভাগ সঙ্ঘচালক পরমানন্দ শর্মা। বর্গে কার্যবাহ ও মুখ্যশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে কে. ত্যাগরাজন এবং জি. গোপাল রাও। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সহ ব্যবস্থা প্রমুখ অনিল ওক এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট।

মাদপুর রুপা সরস্বতী শিশু মন্দিরে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গত ১৭ মে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুর রুপা সরস্বতী শিশু মন্দিরে এলাকার ১৬০ জন কৃতী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের মায়েদের এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সেবা প্রমুখ ধমঞ্জয় ঘোষ এবং বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের কার্যকর্তা সঞ্জীব দাস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলা প্রচার প্রমুখ জয়দেব দাস এবং মাদপুর খণ্ড কার্যবাহ সুশোভন মান্না।

ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের সভা

গত ২০ মে আগরতলায় ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের রাজ্য কাযালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি সবুজ সরকার। সভায় আগামী কর্মসূচি নিয়ে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠন মন্ত্রী রাজীব বণিক এবং ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক রিকশা শ্রমিক সঙ্ঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক খোকন ঘোষ।

কোচবিহার মাহেশ্বরী মন্দিরে সীতানবমী উদ্‌যাপন

গত ১৬ মে কোচবিহার শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত মাহেশ্বরী মন্দিরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাতৃশক্তি আয়ামের দুর্গবাহিনীর উদ্যোগে ধুমধামের সঙ্গে সীতানবমী উদ্‌যাপন করা হয়। এদিন মা সীতার সঙ্গে ভারতমাতার পূজা করা হয়। অনুষ্ঠানে তথাকথিত বিশেষ শ্রেণীর ৫জন মায়ের পা ধুইয়ে দিয়ে সমানতার বার্তা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধ্বী মাহেশ্বরী গিরি, বিশিষ্ট মহিলা কবি শ্রীমতী কলাবতী কর এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনুপ মণ্ডল।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রসাদ বিতরণের পর ২০০ মা-বোনের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার

আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জৈন মন্দিরে শেষ হয়। সেখানে ভাষণ রাখেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত মাতৃশক্তি সংযোজিকা শ্রীমতী মৌমিতা মিত্র।

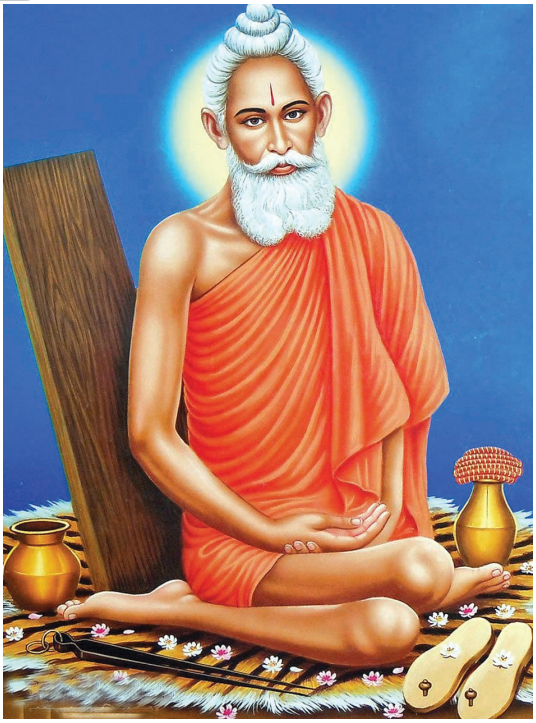

আধ্যাত্মিক জগতের নক্ষত্র
মহাযোগী বাবালোকনাথ

গোপাল চক্রবর্তী

১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট, বাংলা ১১৩৭ সনের ২৫শে শ্রাবণ শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত কচুয়া গ্রামে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামকানাই ঘোষাল এবং ভক্তিমতী কমলা দেবীর সংসারে মহাযোগী লোকনাথের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন বাবা-মা'র চতুর্থ সন্তান। বাবা-মা দু'জনেরই ইচ্ছা ছিল লোকনাথ সংসারী না হয়ে সন্ন্যাসী হোক। একাদশ বর্ষে লোকনাথের উপনয়ন হলো। উপনয়নের পর আচার্যগুরু গৃহী সাধক ভগবান গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে সমর্পণ করা হলো লোকনাথকে। বাবা-মা ও গ্রামবাসীদের চোখের জলে ভাসিয়ে লোকনাথ গুরুর সঙ্গে পদব্রজে চললেন মহাতীর্থ কালীঘাটের পথে। এই সময়ে বেণীমাধব নামে সেই গ্রামের আর এক বালক তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। বালকের আগ্রহ ও একাগ্রতা দেখে, বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে ভগবান গঙ্গোপাধ্যায় বেণীমাধবকে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন। দুই বালক শিষ্য-সহ গুরু ভগবানচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন কালীঘাটের গভীর অরণ্যে। দেশে তখনও ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন হয়নি। সারা কলকাতা ছিল জঙ্গলময়। তবে কালীঘাটে সেই সময়েও প্রচুর সাধু, সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিকের অবস্থান ছিল। কিছুদিন কালীঘাটে থেকে গুরু ভগবানচন্দ্র শিষ্যদ্বয়-সহ আরও গভীর অরণ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। এক মনোরম পরিবেশে স্থিত হয়ে শুরু করলেন কঠোর যোগ অনুশীলন। প্রথমে নক্তব্রত অবলম্বন। দিনে উপোস। নক্ত অর্থাৎ রাত্রিতে হবিষ্য, তিল ও দুগ্ধ সেবন। এরপর একান্তরা, একদিন পর একদিন উপোস। তারপর ত্রিরাত্রি, পঞ্চাহ; নবরাত্রিতে নয় দিন উপবাস। শুরু হলো কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন। বাইরে উপবাস। অভ্যাস এবং ভিতরে সমাধি অবলম্বন। পক্ষাহ পনেরো দিন উপবাস, শেষে মাসব্রত একমাস উপবাস। লোকনাথ কঠোর ব্রহ্মচর্য সাধন করতে করতে সবিকল্প, নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত অভ্যস্ত হলেন। সমাধি অবস্থায় জাতিস্মর হয়েছিলেন। স্বপ্নের মতো পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ হয়েছিল।

জ্ঞানপন্থী গুরু ভগবান গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অর্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেন প্রাণাধিক শিষ্যদ্বয়ের কাছে। হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ ও মন্ত্রযোগের মাধ্যমে তাঁরা সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হলেন। অবশেষে গুরুদেব লোকনাথ ও বেণীমাধবকে নিয়ে কাশীধামের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। সেই সময়ে কাশীর পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম। কাশীর পথে হিতলাল মিশ্র নামে একজন সিদ্ধ যোগীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো। মিশ্রজীর অনন্যসাধারণ সাধন শক্তির পরিচয় পেয়ে বৃদ্ধ ভগবানচন্দ্র আপন শিষ্যদের তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন। তারপর কাশীধামে পৌঁছে মণিকর্ণিকা ঘাটে সমাধিস্থ হয়ে ইহলীলা সংবরণ করলেন ভগবান গঙ্গোপাধ্যায়। মিশ্রজী উপযুক্ত আধার পেয়ে আপন শক্তি সঞ্চারিত করলেন লোকনাথের মধ্যে। লোকনাথও মুক্তপুরুষ হওয়ার জন্য আরও কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। দেবতাত্মা হিমালয়ের উদ্দেশে এবার তাঁদের যাত্রা শুরু। বিপদসঙ্কুল দুর্গম হিমালয় হলো তাঁদের যোগসাধনার প্রকৃষ্ট স্থান। এই হিমালয়েই লোকনাথ পরমার্থ সিদ্ধিলাভ করলেন এবং সমস্ত জীবজন্তুর ভাষা বুঝতে শিখলেন।

হিমালয় থেকে আবার ফিরে এলেন সমতল ভূমিতে। সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে তাঁরা ইসলামের মাহাত্ম্য অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন সুদূর আরবের মক্কা-মদিনায়। এই সফরে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় আবদুল গফুর নামে এক উচ্চস্তরের সুফি সাধকের। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় লোকনাথ আরবি ও ফার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ঊষর আরবভূমি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হিতলালজী তরুণ সন্ন্যাসীদ্বয়কে নিয়ে যাত্রা করলেন চিরতুষারাবৃত তিব্বতের পথে। পরনে বস্ত্র নেই, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কখনো কখনো কন্দমূল আহার। লোকনাথ ব্রহ্মচারী পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠ ভক্তদের বলেছেন এই সময়ে তাঁদের দেহে এক শ্বেতবর্ণ আবরণের সৃষ্টি হয় যা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার আক্রমণ থেকে

তাঁদের শরীর রক্ষা করেছিল। হিমালয়ের নির্জনতায় লোকনাথের যোগসাধনা পূর্ণতা লাভ করলো। এখানেই তাঁর অষ্টসিদ্ধি লাভ হলো।

অবশেষে গুরুর নির্দেশে লোকনাথ ও বেণীমাধব হিমালয় থেকে নিম্নভূমিতে অবতরণ করলেন আর গুরু হিতলাল মিশ্র প্রবেশ করলেন হিমালয়ের আরও গভীরে। লোকালয়ে এসে লোকনাথ এক মহান কর্মযোগী রূপে করলেন আত্মপ্রকাশ। বাংলা ১২৭০ সনের এক শুভদিনে ব্রহ্মচারী লোকনাথ ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্রের সন্নিকটে মেঘনা নদীর তীরে ছোটো বারদী গ্রামে উপস্থিত হলেন। বাস করতে লাগলেন গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ ভেঙ্গু কর্মকারের গৃহে। প্রথমে গ্রামের মানুষ এই অদ্ভুত প্রকৃতির অর্ধনগ্ন মানুষটিকে পাগল বলেই মনে করলেন। কিন্তু মহাযোগী লোকনাথ বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। গ্রামের মধ্যে ব্রহ্মচারীজীর প্রভাবে এমন কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল যার কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা মেলে না। বাবার কৃপাদৃষ্টিতে মৃত্যুপথযাত্রী নবজীবন লাভ করছে। কাঙ্গাল হয়ে উঠছে বিত্তবান। এই সময়ে বারদীর নয়াবাদের জমিদার নাগবাবুদের মহাবিপদ। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে কোর্টে মামলা চলছে, হার অনিবার্য। লোকমুখে ব্রহ্মচারী বাবার কথা শুনে তাঁরা এসে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। বাবার আশীর্বাদে মামলায় জয় হলো তাঁদের। এই ঘটনার পর নাগবাবুরা ব্রহ্মচারীবাবার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের উদ্যোগে বারদীতে গড়ে উঠলো লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার আশ্রম।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার মারাত্মক অসুস্থ, বাঁচার আসা নেই, চিকিৎসক জবাব দিয়েছেন। বিজযকৃষ্ণ গোস্বামীর প্রিয় ভক্ত শ্যামাচরণ বকসী লোকনাথ বাবার অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতেন। তিনি হত্যে দিয়ে পড়লেন বাবার কাছে, তাঁর জীবনের বিনিময়ে তাঁর গুরু বিজয়কৃষ্ণকে বাঁচাতে হবে। শ্যামাচরণের গুরুভক্তি দেখে প্রসন্ন হলেন ব্রহ্মচারী বাবা। মৃদু হেসে বললেন—

—তুই ঢাকা ফিরে যা। আমি বিজয়ের কাছে যাবো। আগামী পরশু তোরা সংবাদ পাবি।

সেবার মৃত্যুর হাত থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন লোকনাথ বাবা। তিনি বারদীর আশ্রম ছেড়ে যাননি, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের সেবকেরা তাঁর শিয়রে ব্রহ্মচারী বাবাকে উপবিষ্ট দেখেছেন। পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ বিশেষ ভাবে ব্রহ্মচারী বাবার অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ফলে ব্রাহ্মসমাজ তাঁর বৃত্তি বন্ধ করে দেয় এবং তাঁকে হিন্দুপৌত্তলিক আখ্যা দেয়। তখন লোকনাথবাবার নির্দেশে তিনি গোণ্ডারিয়ায় (ঢাকা) কুটির নির্মাণ করে সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর থেকেই তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রূপে খ্যাতিলাভ করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন, বারদী আমার ধর্মজীবনের জন্মস্থান।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রচারে অল্পদিনের মধ্যে বারদীর আশ্রমে নামলো সাধুসন্ত আর ভক্তের ঢল। এই মহাতীর্থের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবাকে দর্শনের জন্য উপস্থিত হলেন। কিন্তু ভাবলেন এই সন্ন্যাসীর তো জাতের নিশ্চয়তা নেই, তাই তাঁর পায়ে হাত দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু যখন তিনি ব্রহ্মচারীবাবার সামনে এলেন তখন সব ভুলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণিপাত করলেন। ব্রহ্মচারীবাবা বললেন,

—বলতো বাবা, কেন বাবা প্রণাম করবে না স্থির করেছিলে?

রায়বাহাদুর অপ্রস্তুত হলেন। আবার ব্রহ্মচারী বাবার পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। বাবাও তাঁকে দুই হাতে আশীর্বাদ করলেন।

একবার এক ফৌজদারি মামলার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে উপস্থিত হয়েছেন ব্রহ্মচারী বাবা। তাঁর বয়স তখন দেড়শো বছর। স্বভাবত দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হবার কথা। বিপক্ষের কৌসুলী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—আপনি বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয় ক্ষীণ, আপনি অত দূরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন কী করে?

লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবা বললেন,

—ঠিক বলেছ বাবা, আমি বৃদ্ধ, তোমরা যুবা।

বেশ দূরের একটা আমগাছ দেখিয়ে বললেন—

—ওই গাছটা দেখতে পাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—বলো দেখি ওই গাছে কোনো প্রাণী ওঠা-নামা করছে কিনা?

কৌসুলী গাছের দিকে তাকিয়ে বলল।

—না। কোনো প্রাণীতো দেখা যাচ্ছে না।

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন—

—আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ওই গাছ বেয়ে একদল লাল পিঁপড়ে ওঠা-নামা করছে।

সবাই গাছের দিকে তাকালো কেউ কিছু দেখতে পেল না। তখন সন্দেহ দূর করার জন্য সবাই গাছের কাছে গিয়ে দেখলো সত্যি সার দিয়ে পিঁপড়ের দল গাছ বেয়ে ওঠা-নামা করছে।

এবারে বিচারক ও কৌসুলীরা অবাক হয়ে গেলেন বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা দেখে। কাছারি শুদ্ধ লোক জানলো চিনলো এ কোনো সাধারণ বৃদ্ধ নন। মহাযোগী মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

যখন যে ভাবে যে মানুষ ব্রহ্মচারীবাবার শরণ নিয়েছেন, তিনি তাঁদের উদ্ধার করেছেন। রোগীদের রোগ নিজের শরীরে নিয়ে তিনি তাদের রোগমুক্ত করেছেন। এই ভাবে রোগ গ্রহণের ফলে তাঁর নিজের শরীর ক্ষয় হতে লাগল। তিনি অনুধাবন করলেন তাঁর ইহলীলা সংবরণের দিন সমাগত। তখন যোগাবলম্বনে তিনি মহাসমাধি গ্রহণ করলেন বাংলা ১২৯৭ সনের ১৯ জ্যৈষ্ঠ দিবা দ্বিতীয় প্রহরে। বাংলা তথা ভারতের আধ্যাত্মিক জগতে এক নক্ষত্র পতন হলো। □

বঙ্গের আলপনায় জৈববৈচিত্র্য

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

জৈববৈচিত্র্য হচ্ছে এই গ্রহের যাবতীয় জীবনের বিভিন্নতার সমাহার। বিভিন্ন ধরনের গাছপালা পশুপাখি এবং বিভিন্ন পরিবেশে এদের বহু বিচিত্র প্রাণের অভিযোজন মিলেই এই 'জৈববৈচিত্র্য'। 'Diversity at all levels of biological organisation' এই গ্রহের সম্পদ।

১৯৯২ সালে রিও-ডি-জেনেইরোতে জৈববৈচিত্র্যের আন্তর্জাতিক অধিবেশন বসে। যাকে বলা হচ্ছে 'বসুন্ধরা বৈঠক' বা Earth summit of United Nations Conference of Environment and Development, ভারত এই বৈঠকের অন্যতম স্বাক্ষরকারী। স্থির হয়, চিরায়ত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বহাল রাখতে, মানবজাতির নিরাপত্তার জন্য মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৌলিক সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ বাস্তুতন্ত্রে কোনো জীবের অবদানই নগণ্য নয়। কিন্তু আমরা কি জানি, ভারতবর্ষের শিকড়-সংস্কৃতি জৈববৈচিত্র্যের উজ্জ্বল উপস্থিতি, তা কী প্রাকৃতিক সংরক্ষণ বিষয়ে বিশেষ বার্তা নয়? শুধুই কি ধর্মীয় আচরণ? ভারতীয় ঐতিহ্যে অপরিমেয় সৃষ্টির জৈবমূল্য নির্ধারণ তো সেই হয়ে আছে কোন প্রাচীনকাল থেকে।

সৃষ্টির সীমাহীন বৈভব দেখেই তো প্রাচীন ভারতবর্ষের মনোভূমিতে এক 'বিরাট' ব্যক্তিত্ব কল্পিত হয়েছে; ভক্তি-শ্রদ্ধায় যাঁর কাছে নত হওয়া যায়। বাঙ্গলার আলপনার মধ্যেও রয়েছে 'বিরাট'-এর প্রতি উদ্দেশ্য করে বাঙালি মায়ের কামনা-বাসনার নানান চলচ্চিত্র—ব্রতপার্বণ, সাধন-আরাধন; আর তাতে নানান জৈববৈচিত্র্যের ছড়াছড়ি।

ভারত জৈববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আর এ রাজ্য ছ'টি কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলের সমাহারে রচিত। ফলে কৃষি-জলবায়ুর বৈচিত্র্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ বিন্যাসে বৈচিত্র্য এসেছে। এই বৈচিত্র্য বাঙ্গলার লোকসমাজ চেনেন, জানেন এবং ব্যবহার করেন নানান ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায়। জৈববৈচিত্র্য সংক্রান্ত বনবাসী ও গিরিবাসী মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারও অপ্রতুল নয়। যে রাজ্য ভৌগোলিক অবস্থানে জৈববৈচিত্র্যে সমাকীর্ণ, সে রাজ্যের লোকসংস্কৃতিচর্চা থেকে তা বাদ যাওয়ার কথা নয়, বাদ যায়ওনি। সে বিষয়ে এই লেখিকারই একটি বই রয়েছে---'বাঙ্গলার জৈববৈচিত্র্য ও লোকসংস্কৃতি', তাতে উল্লেখ আছে সামান্য তৃণ থেকে শুরু করে মহীরুহ, মশা-মাছি, হাতি কোনো কিছুই বাদ পড়ে না লোকসংস্কৃতির উপাদান-উপকরণ থেকে। বর্তমান প্রবন্ধে আলপনার চিত্রগুলিকে পর্যালোচনা করে দেখাতে চাইবো জৈববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে বাঙ্গলার আলপনা কোথাও কোথাও কাহিনির জন্ম দিয়েছে। বনচারী সংস্কৃতির ছোঁয়ায়, কৃষি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় আলপনার মণ্ডনশিল্প অতীতের যোগসূত্ররূপে উত্তরসূরীর কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে একটি দৃশ্যমান লোকসংযোগ প্রক্রিয়ার সফল মাধ্যমে।

আলপনাকে বলা যায় ব্রতিনী নারীর অথবা পূজারিণীর মনের নীরব অভিব্যক্তি। ঈশ্বরের কাছে বার্তা হিসাবে পাঠানো হয় নারীমনের বহুবিচিত্র কামনা-বাসনা, যা একদিন সম্ভব করে তুলতে হবে। পিটুলিগোলা জল দিয়ে মেঝেতে, মাটিতে আঁকা হয় কামনা-বাসনার চিহ্ন-সংকেত। যিনি দেখেন তাঁর কাছেও পৌঁছে যায় বার্তাটির প্রকৃত বক্তব্য। লৌকিক অথবা পৌরাণিক দেবদেবীর কাছে ব্রতিনী কী কী উদ্ভিদ এবং প্রাণীসম্পদ চাইছেন, তা জানা যায়। অতএব আলপনার সংযোগ সামর্থ্য অসাধারণ।

উর্বরা ধরণীর গর্ভস্থ সন্তান হচ্ছে শস্যবৈচিত্র্য। প্রকৃতি যেন গর্ভিণী নারীর মতোই ফলবতী। ব্রতের আলপনার নানান আঙ্গিকে ব্রতিনী এই শস্যসম্পদের ছবি পিটুলিগোলায় এঁকে পরমেশ্বরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, গোলাভরা শস্য তার একান্ত অভিপ্রেত। তাই এগুলিকে সামগ্রিকভাবে বলা যায় কামনাত্মক আলপনা। সন্তান আর শস্য উৎপাদন তো আলাদা নয়। নারীর শরীর থেকে ফলে মানবসন্তান আর ধরণীর বক্ষের ধন হচ্ছে ফসল। এই দু'য়ের মধ্যে দারুণ মিল। সন্তান আর শস্যের প্রতি ব্রতিনী নারীর প্রগাঢ় বিস্ময়বোধ আলপনায় এনে দিয়েছে নানান ফসলের কারুকাজ। হয়তো তার প্রচলন এখন আমরা ততটা দেখতে পাই না, কালচারাল ইরোশন বা সাংস্কৃতিক বিলুপ্তির কারণে হয়তো তা হারিয়ে যাচ্ছে। তবে একদা এসব ছবি ভূমিতে আঁকা হতো। আজও আলপনায় ধান আঁকার সংস্কৃতি ধরে রেখেছে বাঙ্গালি, কারণ গ্রামীণ বাঙ্গালির কাছে 'ধানই লক্ষ্মী'। আলপনায় ধান, ধানছড়া, মরাইয়ের বহুল ব্যবহার। ধান সম্পর্কিত এই ইঙ্গিত লক্ষ্মীর প্রতীক হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালিকে অনেকসময় গমের শিসও আঁকতে দেখা গেছে

প্রাণ ভরে। ধানগাছ বাতাসে আন্দোলিত হয়ে ঢেউ খেলে যায়, শস্যের ভারে নুইয়ে পড়ে, তাই আলপনায় ধানের শিস এবং গমের শিস বাঁকানো অথবা লতানো।বহু লৌকিক আলপনায় রকমারি ফলের সমারোহ চোখে পড়ে। কারণ বাঙ্গালি নানান মরশুমি ফলের প্রাচুর্যে বড়ো হয়েছে। বাঙ্গালির প্রচলিত কথায় রয়েছে, ''বারোমাসে বারো ফল/না খেলে যায় রসাতল।'' আলপনায় আঁকা হয় ঘট, তাতে নারকেলের ছবি। সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় গুয়া বা সুপারি গাছের ছবি—কোঁচা দুলিয়ে সুপারিবাগানে গৃহকর্তা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেলপুকুর ব্রতের আলপনাতেও সুপারি গাছের ইঙ্গিত মেলে। ইদানীং কৃষিমেলা, কৃষি আলোচনা সভায় এবং মান্য কৃষি প্রতিষ্ঠানে আলপনায় অথবা রঙ্গোলিতে নানান ফল ও সবজিভাণ্ড আঁকা হয় বৈচিত্র্যের পরিবেশনার লক্ষ্য নিয়ে। বার্তা এই, অর্থকরী এই ফল ও সবজিগুলি চাষ করে কৃষককে লাভের মুখ দেখতে হবে। সরকারি আধিকারিক এবং কৃষিবিজ্ঞানীদের কাছে কৃষিজীবী মানুষের বার্তা, এই সমুদায় ফসলের উন্নত-জাতপ্রজাতি আমাদের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা হোক। হয়তো ঈশ্বরের কাছেও এই ডাইভার্সিটি ফার্মিঙে সফল হবার আবেদন।

লোকসমাজের কাছে সাপ ও উর্বরতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই সর্পিল লতা সন্তান কামনারই অঙ্গ। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে মনসা পূজার নানান আলপনায় সাপের অবয়বগত বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। পরোক্ষভাবে সর্পিল লতায়, ধানের গুছিতে অথবা মরাইয়ের পাশে সাপের চলার চিহ্নের মতো ছবি আঁকা হয় অনুকরণাত্মক জাদু ফুটিয়ে তোলবার জন্য। সাপের বংশবিস্তারের অনুরূপ উর্বরতা কৃষিক্ষেত্রেও আসুক, এই প্রার্থনা। ইঁদুর দমন করে সাপ, ইঁদুর ফসলের ধ্বংসাত্মক শক্তি (অলক্ষ্মী), সাপ আলপনায় এসেছে কৃষিদর্শনের আলোতে। বাস্তুতন্ত্রে সাপের উপযোগিতা আজ বিজ্ঞানসম্মতভাবেই স্বীকৃত।

সাপ ছাড়া সরীসৃপ গোত্রীয় কুমিরের চিত্র আঁকা হয়, আঁকা হয় মকরের ছবি। ভাদুলী ব্রতের আলপনায় ব্রতিনীর জলযাত্রী বাপ-ভাই যাতে নদী-সমুদ্রে কুমিরের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় সেজন্য কুমিরের ছবি আঁকা হয়।

বিবাহকেন্দ্রিক আলপনায় নানান রকমের জোড়াফুল আঁকা হয়; আঁকা হয় পদ্মফুল, ভ্রমর, নানান রকম প্রজাপতি। অন্নপ্রাশনের আলপনায় নবজাতকের শৌর্য-বীর্য, বল ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের কামনায় দ্যোতক হিসাবে আঁকা হয় বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি প্রাণী। আর ঐহিক সমৃদ্ধি এবং পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ হিসেবে আঁকা হয় ধান।

সমৃদ্ধির কামনাত্মক ব্রতে যুগপৎ অর্থনৈতিক চেতনা এবং বিশ্বাস-সংস্কারের আবহে আলপনাগুলিতে মাছ (সধবার প্রতীক), কলাগাছ, পানপাতা (স্বামী সোহাগের প্রতীক) ও কড়ি (যৌন আকাঙ্ক্ষা এবং মাতৃঅঙ্গের প্রতীক) আঁকা হয়। কামনাত্মক আলপনায় মাছের ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে সিঁথির সিঁদুরকে অক্ষুণ্ণ রাখা। নান্দনিক আলপনায় আঁকা হয় নানান রকমের লতা এবং বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের যৌথ-প্রকাশের প্রতিরূপ। যেমন কলমিলতা, কলালতা, চাঁপালতা, দোপাটিলতা, চালতালতা, মোচালতা, শিসলতা, কলাছড়ি ইত্যাদির ছবি। চারিদিকে বৃত্তাকারে লতার বেড়ি, আর ভেতরে পদ্মমণ্ডল। কেন্দ্রে চিত্রিত পদ্মকে ঘিরে আলপনা আঁকার এই রীতিকে বলা হয় 'পদ্মচক্র'। এর মধ্যে শিল্পীমনের সহজাত অভিব্যক্তি, বাস্তব ও কল্পনা সব মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে গেছে।

মাঘমণ্ডল ব্রতের আলপনায় দেখা যায় বিবিধ মাঠের ফসলের নকশা; কোনটি ডালশস্য, কোনোটি তৈলবীজ বা তণ্ডুল ফসল। যেমন—ধান, গম, মুসুরি, সরষে, মাষকলাই, মটর, ছোলা, খেসারি প্রভৃতি ফসল। অনেক সময় এই আলপনার সঙ্গে বেলের আঠা দিয়ে এই সমস্ত ফসলের দানাগুলি লাগিয়ে সুন্দর করে নকশা করা হয়। বেলপুকুর ব্রতের আলপনায় অনেকসময় বটগাছ, বেলগাছ সহ নানান গাছের ছবি চিত্রিত হয়। হয়তো দেখা যায় গ্রামবাঙ্গলায় পুকুরপাড় জুড়ে থাকা গাছগুলিই এই আলপনার ছবিতে নীরব অভিব্যক্তি হয়ে ধরা পড়ে। তেমনই অশ্বত্থপাতা ব্রতের আলপনায় অশ্বত্থ পাতার ছবি চোখে পড়ে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত তুলসীতলায় ঝারা দিয়ে সেচের বন্দোবস্ত করে পালিত বসুধারা ব্রতের আলপনায় তুলসীগাছের ছবি আঁকা হয়।

আলপনায় পূর্ণ বিকশিত পদ্ম, শঙ্খপদ্ম, যুগ্মপদ্ম, সবগুলিই আসলে উর্বরতার প্রতীক। তা নারী প্রত্যঙ্গের প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে চিত্রায়িত হয়েছে। কখনও দেখা যায় প্রস্ফুটিত পদ্ম, কখনও পীনোন্নত পদ্মের কুঁড়ি। অনেকের মতে, বাঙ্গলার আলপনায় পদ্মের উপস্থিতি অজন্তার গুহাচিত্রের আদলে অঙ্কিত হচ্ছে। তবে তার আগে থেকেই এই পদ্মসংস্কৃতির উদ্ভব বলে মনে করা যায়। কারণ পদ্মফুল বঙ্গে একটি অতি পরিচিত এবং ব্যবহারের ফুল। বউ-ছত্রের আলপনায়, 'ঘট-লাজ'-এর আলপনায় পদ্ম অঙ্কন আবশ্যিক। লক্ষ্মীপূজার আলপনায় পদ্মের উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেবী পদ্মাসনা। মনসা পূজার আলপনাতেও পদ্ম আঁকার প্রবণতা দেখা গেছে। দেবী মনসার নাম 'পদ্মাবতী'।

লক্ষ্মীপূজার আলপনায় পেঁচা প্রায় আবশ্যিক। তবে এলাকাভেদে অঙ্কিত পেঁচার আদল ভিন্ন– কোথাও উড়ন্ত, কোথাও স্থির, নিশ্চুপ। যেমন লক্ষ্মীপিঁড়ির আলপনায় স্থির পেঁচার ছবি। পেঁচা ছাড়া আলপনায় ময়ূর, হাঁস, কাকের ছবি পাওয়া যায়। সুবচনী ব্রতের আলপনায় এক-ঝাঁক হাঁস আঁকতে হয়। সেই হাঁসের ছবিতে দ্রুত হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিতে যদি হাঁস পাখা মেলে ধরে, তাতে যেমন দেখতে লাগে, তেমন করেই আঁকার প্রবণতা। নবান্নের আলপনায় আগে আঁকা হতো দাঁড়কাকের ছবি। কার্তিকপূজার আলপনায় আঁকা হয় ময়ূরের ছবি। আলপনায় কাল্পনিক পাখির ছবির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন 'ডুমখোর', 'হেঁচি-করকচি', 'গোড়াগুড়ি' প্রভৃতি। এটাকে 'লোকসংস্কৃতির কল্পনা-বিলাস' বলা হলেও বাস্তবের সঙ্গে এই ঠাঁটের যথেষ্ট মিল আছে। আমরা লৌকিক ছড়াতেও দেখেছি হাট্টিমাটিম, লটকুনো, হীরামন প্রভৃতি পাখির প্রসঙ্গ। এরমধ্যে হাট্টিমাটিম সম্ভবত হুতোম পেঁচা। গবেষণার মাধ্যমে বাকি পাখিগুলির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা এলাকায় লক্ষ্মীপূজার আলপনায় শেয়ালের ছবি আঁকা হয়। এদিকে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে শেয়াল লক্ষ্মীর বাহন বলে পরিচিত। অনেক সময় বনের উপান্তে বসবাসকারী মানুষ বন্য জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে রেহাই পেতে বন্যপ্রাণীর ছবি আঁকে এবং প্রার্থনা করে। এভাবেই কোথাও কোথাও বাঘ, হাতি, চিতা, নেকড়ে, বিষধর সাপের ছবি আঁকা হতে থাকে।

বিভিন্ন ব্রতের আলপনায় যে সমস্ত জৈববৈচিত্র্যের ছবি আঁকা হয়, তার মধ্যে বাঙ্গলার অঙ্গনাদের গোয়ালভরা গোরু-ছাগলের স্বপ্ন ফুটে উঠেছে। ফুটেছে গবাদি পশুর কামনা। অঙ্গনারা চেয়েছে পুকুরভরা মাছ, উঠোনভরা পক্ষী-সম্পদ। আলপনায় রয়েছে পরিবেশ ভাবনার নিদর্শন। চন্দ্র, সূর্য, তারা, নদী, সমুদ্র, পর্বত, বনানী এবং জৈববৈচিত্র্য নিয়েই যাবতীয় চিত্রকল্প। যা আঁকা হয়, তা স্থানীয় লোকশিল্পীর চেনা-পরিচিত জগতের ছবি। সব মিলিয়ে সহজাত নান্দনিকতায় হয়ে উঠেছে শিল্পী মনের অপূর্ব চলচ্চিত্র। □

ধূমধাম আর হুজুগটাই বড়ো

সচেতনতা কোথায়?

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের সময়ে শহুরে, নাগরিক মানুষের চেতনা জাগে, বিশ্ব এক উষ্ণ-বাসরে পরিণত হয়েছে। তাই ব্যাপকভাবে গাছ লাগাতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় করে খরা-চিত্র পরিবেশিত হয়, গাছ লাগানোর নানান ছবি ধরা পড়ে, আর সবাই সবাইকে গালমন্দ করে। তারপরই ঠিক হয়— প্রকৃতি বাঁচাতে হবে। অকাল বনমহোৎসবের বন্যা সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে। কিছু গাছ সংগ্রহ করে সেলফি তোলার ধুম পড়ে যায়। তারপর রিমঝিম বর্ষা। পূজা পূজা ভাব এসে যায়, গাছ লাগানোর কথা আর মনে থাকে না, পরের বছরের পড়া ভেবে আলমারিতে তুলে রাখি মননকে।

এর ফলে কী আদৌ বেশি মাত্রায় গাছ লাগানো হচ্ছে? এত আয়োজনের ফল কী?

আমার মনে হয় গাছের সংখ্যা ঢক্কানিনাদের হারে বাড়ছে না। প্রচারে অন্তরাত্মা না জেগে ভার্চুয়ালিটি আত্মপ্রকাশ পাচ্ছে। কারণ, গাছ লাগানোর উপযোগী চারা বিগত বছর থেকেই তৈরি করে নিতে হয়, যেমন আমের চারা, কাঁঠালের ভালো জাতের চারা, লিচুর চারা, সবেদার চারা, নারকেলের চারা, পেয়ারার জোড়-কলমের চারা আগের বছরেই তৈরি হয়ে যায়। হুজুগে লোক সেই পূর্ব-প্রস্তুত চারার সম্ভারই ব্যবহার করেন, নতুন উদ্যোগ তারা নেন না, ফলে নতুন গাছ কোথায়? নতুন গাছ যদি লাগানোর কথা ভাবতে হয় তবে, সেই সংস্থা বা সংগঠনকে নিজের উদ্যোগে নার্সারিতে পরের বছরের জন্য চারা তৈরি করে বা করিয়ে নিতে হবে। ধারের জীবন দিয়ে বনমহোৎসবের কাজ কতটা এগোবে?

কয়েক বছর ধরেই নানান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে বারেবারে বলেছি (যাদের চারা তৈরি করে নেবার সুযোগ আছে), নিজেদের প্রয়োজনীয় চারা তৈরির জন্য যে ঘরোয়া নার্সারি তৈরি হবে তার প্রযুক্তিগত তথ্য দিতে রাজি আছি, আপনারা আমাদের কাছে বছরের পর বছর চারা না চেয়ে নিজেরা তৈরি করে নিন। উদ্যানবিদকে তদারকির জন্য ডাকুন, রাজ্য-জুড়ে হাজার হাজার ছোটো মাপের নার্সারি তৈরি হোক, তারই ডগমগে চারা দিয়ে আয়োজন করুন বনমহোৎসবের পুণ্যতিথি। দয়া করে সেলফি-উৎসবে ডাকবেন না। নানান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাই এ বছরের জন্য চারা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে নিজেদের দায়িত্বশীল হবার প্রমাণ দিতে হবে, প্রচারের আলতো ছোঁয়া নয়। দু' একশো চারা কিনে বা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চেয়ে নিয়ে, ঘটা করে প্রচার-সর্বস্ব বৃক্ষ রোপণের আয়োজনের মধ্যে তেমন কার্যকারিতা নেই। তিনি বা তারা ওই গাছগুলি না কিনলেও, না চাইলেও তা বিকোতো, লাগানোও হতো। তাহলে আপনি/আপনারা কী নতুন কাজটি করলেন? ওটা নার্সারিম্যানরা ডিম্যান্ড-সাপ্লাই অনুযায়ী তৈরি করেছিলেন। যেটা কৃষক/কৃষিজীবী মানুষ নিজের জমিতে লাগাতেন, আপনি তারই খানিকটা উৎসব করে মেরে দেওয়ার আয়োজন করলেন। যদিও এর ব্যতিক্রমী চিত্র আছে, সবাই এমনটি করেন না। দায়িত্বশীল আয়োজকও আছেন।

হুজুগে বনমহোৎসবের চারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় আশি শতাংশ, কিছু বেশিও হতে পারে। যে ফলের চারা কৃষিজীবী-গ্রামীণ মানুষ লাগাতেন নিপুণ হাতে তার নিজের জমিতে, অদক্ষ হুজুগে সোশ্যাল মিডিয়া-ওয়ালারা তার প্রাণের অপচয় করছেন। তাই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাথাদের বলবো, চারাগাছ কীভাবে বেঁচেবর্তে থাকবে, কীভাবে তার যত্নআত্তি, একটা চারাগাছকে মহীরুহ বা পল্লবে-কুসুমে বিস্তার করাতে কী প্রয়োজন তা বোঝানোর দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদের। প্রতিটি চারা বেঁচে রইলো কিনা, তার তদারকি ও সমীক্ষা জরুরি। গাছ লাগালেই দায় শেষ নয়, গাছ বাঁচানোর জন্য সেলফি-ওয়ালাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গ্রামে, কৃষি জমির পাশে, এমনকী শহরের নানা জায়গায় নানান বৃক্ষের তলায় বীজ পড়ে অসংখ্য চারা বের হয়, যেমন নিম, গুলমোহর, পেল্টোফোরাম (বাসন্তী), জিলিপি (ইনগা), গ্লিরিসিডিয়া, বাক্সবাদাম, কাঠবাদাম, মহানিম প্রভৃতি। এই চারা গাছগুলি অন্যথায় আগাছা পরিষ্কারের নামে তুলে ফেলা হয়, কোথাও আগাছানাশক ব্যবহারে মারা পড়ে। প্রকৃতিপ্রেমীরা বরং এই গাছের চত্বরে জন্মানো, পার্ক-উদ্যানে অযাচিতভাবে জন্মানো শিশুচারা গাছগুলি বর্ষার মরশুমে পরম মমতায় তুলে ছোট্ট মাটির টবে মাটি-জৈবসার মিশ্রণে লাগিয়ে তা খানিক বড়ো করে তুলুন এবং আয়োজকদের দিন, অথবা নিজেই আয়োজন করে নিন বনমহোৎসবের উৎসব।

এই রাজ্যকে, এই দেশকে, এই পৃথিবীকে সবুজ করতে হলে, উষ্ণায়নকে ঠেকাতে হলে, ভূমিক্ষয় রোধ করতে হলে, পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হলে বৃহৎ বৃক্ষের বিকল্প নেই। সমাজভিত্তিক বনসৃজনের অঙ্গ হিসেবে ফলের গাছ বেশি করে লাগালে নানান পাখি বৈচিত্র্য আসবে, আসবে কাঠবেড়ালি-হনুমান। কিছু ফল স্থানীয় শিশু-কিশোরও পাবে। যে গাছগুলোর ফল কেউ খায় না এবং যা লাগালে অন্য গাছ ঠিকমতো বাড়ে না, তা লাগিয়ে কী লাভ? আঞ্চলিক গাছ লাগানোর উপর বেশি মনোযোগ দেওয়া হোক, হারিয়ে যাওয়া ফলের গাছও থাকুক। আয়োজকেরা গাছ নির্বাচনের সময় সমস্ত বিষয় খেয়াল রাখুন।

(বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

জলাভূমি ও কলকাতার বন্যা

মোহিত রায়

কলকাতা গড়ে উঠেছিল জলা, বাদা বুজিয়েই। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বর্ণনায়, 'যে সকল স্থান বর্তমান সময়ে শিয়ালদহ ও বউবাজার বলিয়া প্রসিদ্ধ সে সমস্ত স্থান পর্যন্ত লবণ জলের হ্রদটি বিস্তৃত ছিল।' লবণ জলের হ্রদটি ছিল কলকাতার পূর্বপ্রান্ত জুড়ে বিশাল জলা, খাল আর নদীর এক সমাহার। জোয়ার-ভাটা খেলা নোনা জলের বিদ্যাধরী নদীর প্লাবনভূমি ছিল এই বিশাল জলা অঞ্চল। জলা বুজিয়ে কলকাতার বিস্তার নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর বিখ্যাত শহরগুলির অনেকটাই গড়ে উঠেছে জলা বুজিয়ে— লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভেনিস, নিউ ইয়র্ক, সেন্ট পিটার্সবার্গ, ওয়াশিংটন ইত্যাদি। কলকাতার পশ্চিমে গঙ্গানদী, ফলে পূর্বদিকেই তার বিস্তার ছিল স্বাভাবিক। ফলে বেশ কিছু জলাজঙ্গল বুজিয়েই এই শহর। ইতিমধ্যে বিদ্যাধরী লুপ্ত হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে, জোয়ার-ভাটাহীন জলা বাদা এখন মিষ্টি জলের মাছের ভেড়ি। তবু তিনশো বছর পরেও শহরের পূর্বদিকে সেই জলা বাদার কিছুটা রয়ে গেছে যার আধুনিক নাম পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। এটিও আপাতত রক্ষা পেয়েছিল ১৯৯২-এর 'পাবলিক' নামক একটি পরিবেশ সংগঠনের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের আদেশের ফলে। এরপর এই ১২৫০০ হেক্টরের জলাভূমি (এর সবটা জলা নয়, এতে চাষের ক্ষেত, আবর্জনা ক্ষেত্র, বসতি রয়েছে) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে রামসার জলাভূমি হিসেবে। তবে এই জলাভূমির মানচিত্র এবং তাতে চাষ ও বসতি জমির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কিছু বিতর্কও রয়েছে।

এটা এখন সর্বজ্ঞাত যে কলকাতা মহানগরের মধ্য অংশ নীচু, আর শহরের সাধারণ ঢাল পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মেই শহরের বৃষ্টির জল গড়াবে পূর্বদিকে, সে জল ধরবে পূর্ব কলকাতার জলা বাদা। সুতরাং সেই জলা বোজাতে থাকলে যে শহরে জল জমবে তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। ১৯৯০ সালে কলকাতার তথাকথিত তিনশো বছর পূর্তিতে কলকাতার পরিকল্পনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ) পরবর্তী পঁচিশ বছর অর্থাৎ ১৯৯০-২০১৫ সাল পর্যন্ত কলকাতার উন্নয়নের একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে বলা হয়, ''ডায়মন্ড হারবার রোড ও সুবোধ মল্লিক রোডের প্রশস্তকরণ এবং ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাশের নির্মাণ দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের যোগাযোগকে সহজ করেছে। এর ফলে জমির হস্তান্তর ও উন্নয়ন কার্য শুরু হয়ে গেছে। যথেচ্ছভাবে সবুজ এলাকা, জলাশয়, জলাভূমি দখল হয়ে যাচ্ছে। এই ঝোঁকটিকে রুখতে হবে এবং উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। ইতিমধ্যে পূর্ব কলকাতার ৫৫০০ হেক্টর জমি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের গতিমুখকে পালটে উত্তর ও পশ্চিমমুখী করতে হবে।''

রাজ্য সরকার নিজেই এইসব নীতিকথা মানেনি। সায়েন্স সিটি তৈরি হলো ধাপার একটি অংশ বুজিয়ে। আদালতের আদেশে কিছু জলাভূমি বাঁচল কিন্তু ১৯৯৬ সালে পূর্ব কলকাতার, সরকারি ভাষায় Eastern Fringe of Calcutta-র জমি ব্যবহারের পরিকল্পনায় (Land Use and Development Control Plan-LUDCP) একটি গ্রামাঞ্চলের মানচিত্রে কলকাতা শহরের জমি ব্যবহারের পরিকল্পনাই টুকে বসিয়ে দেওয়া হলো। নতুন সময়ের পরিবেশ ভাবনায় কিছু তাতে থাকল না। ফলে এই প্রান্তিক পূর্ব কলকাতায় গড়ে উঠল আবাসনের সারি, কিছু শিল্প এলাকাও। এতে ইএম বাইপাস পূর্বদিকে যাওয়া জলের স্বাভাবিক গতিপথ অনেকটাই রুদ্ধ করেছে। তারপর অপরিকল্পিত নতুন শহরতলিতে কলকাতা শহরের বর্ষার জল ধারণের উন্মুক্ত ক্ষেত্র কিছুই রইল না। Waste Recycling Region (WRR) বলে যে জলাভূমি কৃষিক্ষেত্র রইলো তাকেও রক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠল।

২০১৯-এর অক্টোবরে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল তাদের রিপোর্টে জানায় যে, পূর্ব কলকাতার জলাভূমির অনেক জায়গায় জলা বুজিয়ে বাড়িঘর তৈরি হয়ে গেছে। ২০০২ ও ২০১৬ সালের উপগ্রহ মানচিত্র তুলনা করে এই রিপোর্টে তা দেখানো হয়েছে। ইতিমধ্যে এইসব দখল নিয়ে ৩৫৭টি অভিযোগ থানায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে সরকার সক্রিয় হয়। এই জলাভূমির ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের পরিবেশ মন্ত্রী, মুখ্যসচিব-সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত একটি আয়োগ রয়েছে। তবু সদিচ্ছা ও বাস্তবের মধ্যে অনেক ফারাক থেকেই যাচ্ছে। এই জলাভূমি শুধু প্রাকৃতিক উপায়ে গড়িয়ে আসা জলই ধারণ করে না, কলকাতা শহরের নিকাশি খালের বৃষ্টির জল ও ময়লা জলের একাংশ এই জলাশয়গুলি ধারণ করে। সব মিলিয়ে এই জলাভূমি কলকাতা মহানগরের বর্ষার জলের কিছুটা গ্রহণ করে শহরের সমস্যাকে লাঘব করে। পূর্ব কলকাতার জলা, কৃষিজমি, উন্মুক্ত স্থান— এই সবকিছুর উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য কলকাতা পুরসভাকে সক্রিয় হতে হবে।

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, কলকাতা শহরের বর্ষার সময়ে অতি বৃষ্টিজনিত জলমগ্নতা কেবল প্রাকৃতিক উপায়ে সমাধান করা যাবে না। কলকাতা শহরের বর্ষার ও ময়লা জলের বেশিরভাগটাই নিকাশ হয় পূর্বদিকে প্রধানত বাগজোলা খাল, বেলেঘাটা খাল, কেষ্টপুর খাল, পঞ্চান্নগ্রাম খাল ইত্যাদি দিয়ে। সব জল ফেলা হয় কুলটি গাঙ্গে যা শেষ পর্যন্ত মেশে বিদ্যাধরীতে। এই খালগুলিতে জল ফেলার জন্য প্রয়োজন যে পাম্পিং ব্যবস্থা তা সবসময় যথেষ্ট নয়। এরপর খালগুলি সংস্কারের অভাবে জলধারণ ও বহন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় অতিবৃষ্টি হলে সব জল নিকাশিত হয় না। কলকাতার খাল ব্যবস্থা শুধু জলনিকাশি ব্যবস্থা নয়, তা ছিল নৌপরিবহণের পথও। কলকাতাকে জড়িয়ে থাকা এই খাল ব্যবস্থাকে উন্নত করলে শুধু কলকাতার বন্যা নিয়ন্ত্রণ নয়, ব্যাংককের মতো কলকাতার নৌকা ভ্রমণ রোজকার পরিবহণ হয়ে উঠতে পারে। □

আচার্য কৌটিল্যের পরিবেশ সচেতনতা

ড. রাকেশ দাশ

একটি ছোট্ট জনপদ। সেই জনপদে মানুষের বসবাসের উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থা তো বটেই, তদ্‌ব্যতীত সেই জনপদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাও রয়েছে। জনপদের মধ্যে কৃষিকার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু সেই জনপদে অনেকটাই জমি আছে যা কৃষিকাজের অযোগ্য। সেই জমিতে কী করা যেতে পারে?

ভোগবাদী মনে, প্রোমোটার রাজের যুগে সর্বপ্রথম টাউনশিপের কথাই তো মনে আসবে। কিন্তু সেই চিন্তায় না আছে জনকল্যাণের ভাবনা, না আছে পরিবেশ বা প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতার ভাবনা।

এবার একটু স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করা যাক। সেই জনপদের প্রশাসকরা ঠিক করলেন, কৃষিকাজের অযোগ্য অনাবাদী জমিতে কিছু অগভীর জলাশয় তৈরি হবে এবং অবশিষ্ট অংশে ঘাসের চাষ করা হবে। থাকবে কিছু বড়ো বড়ো ছায়াপ্রদ ফলের গাছ। গবাদিপশু সেই জমিতে মুক্ত ভাবে চরতে পারবে। সেই জমির পাশে আরও খানিকটা জমিতে পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একটি কৃত্রিম বনভূমি সৃষ্টি করা হবে। সেই বনচ্ছায়ায় গড়ে উঠবে একটি গুরুকুল। সেই গুরুকুলে সপরিবারে শিক্ষক এবং গুরুকুলের ছাত্ররা বিদ্যার উপাসনায় নিরত থাকবেন। তারপরে খানিকটা অংশে তৈরি হবে ভেষজ উদ্যান। সেখানে থাকবেন যজ্ঞতত্ত্ববেত্তা ঋষিগণ। তাঁরা নানাবিধ যজ্ঞ ও বিবিধ গবেষণায় নিরত থাকবেন। এরপরে খালি জমিতে থাকবে তপোবন। সেখানে চলতে থাকবে মানব কল্যাণের জন্য নানাবিধ উপক্রমের গবেষণা।

এরপরে একটি অরণ্য সৃজিত হবে, যেখানে থাকবে নানা বন্য পশু। এই মৃগবনে ঢোকা ও বেরোনোর জন্য একটি সরু পথ বাদে বাকি সম্পূর্ণ বনের চতুর্দিকে খনন করা হবে গভীর পরিখা। সেই বনের মধ্যে থাকবে নানা ধরনের ফল, ফুলের গাছ। খেয়াল রাখা হবে যাতে কাঁটাগাছ সেই বনে না থাকে। বনের বিভিন্ন জায়গায় জলাশয় খনন করা হবে যাতে পশুরা জলকষ্ট না পায় কখনও।

তারপরে সেগুন, মেহগনি, শাল, অর্জুন, শিশু, বাবলা, শিরীষ, খয়ের, দেবদারু প্রভৃতি গাছের বন তৈরি হবে যেখান থেকে পাওয়া যাবে আসবাব, বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য কাজের জন্য কাঠ। সেই বনে আরও থাকবে নানা ধরনের বাঁশের ঝাড়। আরও থাকবে বেত প্রভৃতি লতা যেগুলি আসবাব তৈরির কাজে লাগে। আরও থাকবে তাল, ভুর্জ, অগুরু প্রভৃতির গাছ যার পাতা বা বাকলে লেখার কাজ করা চলে। থাকবে পলাশ, কুঙ্কুম প্রভৃতি গাছ যাদের থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে রং পাওয়া যায়। থাকবে আমলকীর মতো নানা ধরনের ঔষধি গুণসম্পন্ন বৃক্ষ। আরও থাকবে এমন সমস্ত গাছ যাদের পাতা, ছাল, ফল, মূল থেকে তৈরি করা যায় কালকূট, হলাহল প্রভৃতি মারাত্মক বিষ। আর সেই জঙ্গলে থাকবে নানা ধরনের বিষাক্ত সাপ, গোসাপ, বিছে, পোকা, বাঘ, সিংহ, চিতা, গণ্ডার, হাতি। স্বাভাবিক ভাবেই সেই বনে থাকবে হরিণ, বন্য মহিষ, গবয় (গয়াল বা মিথুন) প্রভৃতি প্রাণীও।

এই বনের ধারে বনবাসীদের বসবাসের উপযুক্ত সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হবে। বনবাসীরা সেই অরণ্য থেকে উপযুক্ত বনজ সম্পদ সংগ্রহ করবে। তারা সংগ্রহ করবে আসবাব বাদ্যযন্ত্রাদির জন্য কাঠ, বাঁশ। ওষুধ তৈরির জন্য নানা ধরনের বৃক্ষের অংশ। বিষনাশক ওষুধের জন্য সাপ, বিছে, বিভিন্ন বিষাক্ত গাছের বিষ প্রভৃতি। সেই জঙ্গলের পাশে, বনবাসীদের গ্রামের এক ধারে, নদী বা খালের তীর ঘেঁসে তৈরি করা হবে একটি বিশাল বন। যদি নেহাতই নদী, খাল না থাকে তবে সেই বনে খনন করা হবে বিশাল ও গভীর দীঘি। সেই বনে থাকবে হাতির পাল। তৈরি হবে হাতিদের অভয়ারণ্য। সেই অভয়ারণ্য পাহারা দেওয়ার জন্য থাকবে রেঞ্জার বা বনপাল। তারা সেই অরণ্যে ঢোকা ও বেরোনোর রাস্তা জানবে। যদি কেউ অনধিকৃত ভাবে সেই বনে ঢুকে হাতি বা অন্য প্রাণী শিকার করে তবে তাদের শাস্তি দেবে বনপাল। সময়ে সময়ে সেই বনের পশুগণনা করবে বনপাল।

এতক্ষণ ধরে এই সমস্ত পড়ে কি মনে হচ্ছে যে, এগুলি যেন কোনো কবির মানসচোখে দেখা কল্পকাহিনির গল্প? যদি তাই মনে হয়ে থাকে তবে আপনি আশাহত হবেন। এগুলি কোনো কল্পিত রূপকথার বর্ণনা নয়। এটি হলো প্রাচীন ভারতের জনপদ নিবেশ বা সিটি প্ল্যানিঙের বর্ণনা।

আমরা কম-বেশি সকলেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের নাম শুনেছি। অর্থশাস্ত্র হলো অর্থনীতি বিষয়ের গ্রন্থ। কিন্তু বাস্তবে অর্থশাস্ত্রের বিষয় অনেক ব্যাপক এবং সেই কালজয়ী গ্রন্থে আলোচিত অনেক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন, ডিফেন্স স্টাডিজ প্রভৃতি গভীর বিষয়। অনেকেরই ধারণা যে, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রভৃতি উপযুক্ত বিষয়গুলি বুঝি বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ভাবনায় বিকশিত। কিন্তু তাদের ভাবনাকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য স্বমহিমায় বিরাজিত আছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। সেই অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম ভূমিছিদ্রবিধান। ভূমিছিদ্রবিধান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো কৃষির অযোগ্য জমির প্রবন্ধন ব্যবস্থা। এই অধ্যায়ে কৌটিল্য যা বলেছেন তারই অনুবাদ হলো উল্লেখিত বর্ণনা— যেটি পড়ে স্বপ্নে দেখা রূপকথা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। পরিবেশের সুরক্ষার বিষয়ে কৃতিশীল হয়ে প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ করার সুসমঞ্জস্য ব্যবস্থার সূত্র রয়েছে এই বর্ণনার মধ্যে। জীববৈচিত্র্য ও উদ্ভিদবৈচিত্র্য সংরক্ষিত রাখার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে এর মধ্যে। নিঃসন্দেহে বলাই চলে যে, আগামীদিনে যে সমস্ত স্মার্ট সিটি তৈরির পরিকল্পনা চলছে সেই পরিকল্পনার মধ্যে এই অন্তর্দৃষ্টিকে যদি স্থান না দেওয়া হয় তবে সেই সমস্ত পরিকল্পিত স্মার্ট সিটিগুলি একদিন জনমানবহীন ইট-কাঠ- পাথরের ধ্বংসস্তূপ হয়ে উঠবে।

কৌটিল্যকে আমরা জানি একজন বিদ্বান কূটনীতিবিদ হিসেবে। কিন্তু মানুষটি ছিলেন হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূর্ত বিগ্রহ। হিন্দু সভ্যতায় পরিবেশ বা প্রকৃতি মানুষের থেকে আলাদা কিছু নয়। বরং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ একাত্ম। এই একাত্মতার ভাবনাই হিন্দু দর্শনকে অন্যান্য সমস্ত দর্শনের থেকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে। সেই হিন্দু সভ্যতার মূর্ত বিগ্রহ স্বরূপ মানুষটির চেতনার গভীরে যে প্রকৃতিপ্রেম ও পরিবেশ সচেতনতা রয়েছে তার ছিঁটেফোঁটাও হয়তো আজকের সেলিব্রিটি পরিবেশবিদদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। □

শেষবার মাঠে নামবেন সুনীল ছেত্রী

নিলয় সামন্ত

আগামী ৬ জুন ভারতীয় দলের চেনা নীল জার্সিতে শেষবার মাঠে নামবেন সুনীল ছেত্রী। যে কলকাতা থেকে তার নায়ক হয়ে ওঠা, সেই তিলোত্তমায় শেষবার খেলতে নামবেন তিনি। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন ৩৯ বছর বয়সি এই ফুটবলার। তাঁর ফিটনেস এখনো যে জায়গায় রয়েছে, তাতে ব্যাঙ্গালুরু এফসি দলের কোচ তাঁকে প্রতি ম্যাচেই ফার্স্ট ইলেভেনে রাখেন। এই মুহূর্তে আইএসএল-এ ভারতীয় স্ট্রাইকারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই লড়াই করে যাচ্ছেন সুনীল। পেনাল্টি মারায় তো জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু এহেন সুনীলই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের হারের পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন জাতীয় দল থেকে সরে দাঁড়ানোর। তিনিও বুঝতে পারছেন,

যুবাদের এবার আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচে খেলার অভিজ্ঞতা করে দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে, নাহলে আগামী বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব বা এশিয়ান কাপের জন্য তাঁরা তৈরি হতে পারবে না। সুনীলের অবসরের সিদ্ধান্ত অবশ্য ভারতীয় দলের জন্য বড়ো ক্ষতি, মনে করছেন প্রাক্তন তারকা ভাইচুং ভুটিয়া।

সাহেব ভট্টাচার্যের বাবা সুব্রত ভট্টাচার্য আগেই জামাই সুনীলের এই অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্তকে সম্মতি জানিয়েছেন। এবার সেই প্রসঙ্গে এক সংবাদপত্রে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাহেব ভট্টাচার্য বলেন, উনি আরও দুই-তিন বছর খেলতে পারতেন। তবে আমার মনে হয় সঠিক সময়ই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু নয় নম্বর জার্সির সেই দুর্দান্ত পারফরমেন্স মাঠে আর দেখা যাবে না, এটাই কষ্টের।

এদিন একই সঙ্গে জানান, এতদিন ব্যস্ততার জন্য সুনীল তাঁর ছেলে ধ্রুবকে সেই অর্থে সময় দিতে পারতেন না। তবে তিনি এদিন আরও জানান, সুনীল ছেত্রীর অবসর গ্রহণের কথা শুনে আরও অনেকেই যেমন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন, তেমনই একই হাল হয়েছিল তাদের বাড়িতেও। সাহেবের কথায়, 'আমার মা, বোন সকলেই কেঁদে ফেলেছিলেন। সুনীলের মা-ও কেঁদে ফেলেন এই কথা শুনে।' তবে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিলেও ক্লাবের হয়ে 'অধিনায়ক' এখনোও ফুটবল খেলবেন।

আর কয়েকটা ম্যাচ খেলতে পারলেই গোলের সেঞ্চুরি করে ফেলতে পারতেন সুনীল। কিন্তু বুঝতে পারছিলেন, শরীর সায় দিচ্ছে না। শুধু নিজের জন্য দলকে বিড়ম্বনায় ফেলতে চাননি। বরং আপাদমস্তক টিম ম্যানের মতো সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সুনীল। বর্ণময় কেরিয়ারে বিদেশি দলের হয়ে খেলা থেকে ফুটবল বিশ্বে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক গোলের দৌড়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিওনেল মেসিদের পর চতুর্থ স্থানে রয়েছেন তিনি। এহেন কেরিয়ারই এবার শেষলগ্নে। সুনীলের সিদ্ধান্তকে সকলেই স্বাগত জানাচ্ছেন। তরুণদের জন্য জায়গা করে দিতে যে সিদ্ধান্ত সুনীল নিয়েছেন তা সাধুবাদযোগ্য। এরই মধ্যে সুনীল ছেত্রীকে নিয়ে আবেগতাড়িত কলকাতায় তাঁর প্রথম কোচ সুব্রত ভট্টাচার্য, এইচটি বাংলায় জানালেন কীভাবে তাঁকে দলে নিয়েছিলেন তিনি।

সালটা ২০০২। মোহনবাগানের ট্রায়ালে এসেছিলেন ছোট্ট পাহাড়ি একটা ছেলে। তখন বাগানের দায়িত্বে সুব্রত ভট্টাচার্য। নামের পাশে রয়েছে লিগ জয়ের নজির। প্রথমদিন অনুশীলন দেখেই বুঝেছিলেন, এ ছেলে অনেক দূর যাবে। সুনীলের অবসরে সুব্রত ভট্টাচার্য সেদিনের স্মৃতি ভাগ করে নিয়ে এইচটি বাংলাকে বললেন, 'একটা ছেলে হরিয়ানা থেকে এসেছে ট্রায়ালে, আমি কোচ ছিলাম তখন। দেখলাম, একদম বাচ্চা ছেলে। প্রথমদিন এসেই ভলি মেরেছে শ্যাম থাপার মতো। দেখছি, কেউ ওকে ধরতে পারছে না। খুব জোরে দৌড়াচ্ছে। এরপর আমি বললাম, ওকে নিয়ে নাও। সেই শুরু। এরপর তো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন পারিবারিক সম্পর্ক। মানুষ হিসেবে খুব ভালো সুনীল। আমি আমার মেয়েকেও ফোন করেছিলাম, সুনীল তো এখন খেলতে গেছে। সন্ধ্যেবেলা আবার কথা হবে।

জাতীয় দলে সুনীলের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর অবসরে ভারতীয় দলের হাল যে কিছুটা হলেও বেহাল হলো তা স্বীকার করেছেন সুব্রত ভট্টাচার্য। তিনি বলছেন, 'ভারতীয় দলে আর স্টাইকার কোথায় সুনীলের পর? গোল করার লোক কই? তবে পরে ফুটবলকে অনেক কিছুই ফিরিয়ে দেতে পারে ও। ক্লাব ফুটবলে কোচিং করাতে পারে, ভারতীয় দলের কোচ হতে পারে। তবে সঠিক সময়ই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নিলেও সুব্রত ভট্টাচার্য আশাবাদী যে সুনীলের এই মুহূর্তে যা পারফরমেন্স তাতে আগামী ৩-৪ বছর চুটিয়ে ক্লাব ফুটবল খেলতে চলেছেন তিনি। এতদিন ফুটবলের প্রতি যে দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন সুনীল, তা থেকে আগামী প্রজন্ম যদি শিক্ষা নিতে পারে, তাহলে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি সম্ভব, একথা বলাই যায়। □

কাঠের হাঁস তৈরি করে অনবদ্য সাফল্য তরুণ শিল্পীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সূত্র ছিল সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন। এই বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন বিপ্লব সরকার। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের নলতাহার গ্রাম। বালুরঘাট শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলেন অবসর। সামাজিক মাধ্যমের একটি বিজ্ঞাপন আকর্ষণ করে বিপ্লবের চোখ। সেই বিজ্ঞাপনে পাইন কাঠের তৈরি একটি বিশেষ আদলের হাঁস বানিয়ে সরবরাহের কথা লেখা ছিল। তাদের চাহিদা মতো হাঁসের মডেলটি বানান বিপ্লব। তারপর কলকাতায় সেই মডেলটি পাঠালে বিজ্ঞাপনদাতাদের তরফে সাড়া মেলে। বিপ্লবের বাবার নাম নবান সরকার। ফেসবুকে যোগাযোগ হওয়ার পর কলকাতার এই সংস্থাটির তরফে ২,০০০টি কাঠের হাঁস তৈরির বরাত পেয়েছেন বিপ্লব।

কলকাতা থেকে ওই সংস্থার তরফে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাইন কাঠ এসে পৌঁছতে থাকে বালুরঘাটে। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁস তৈরির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিপ্লব। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এলাকার ১০ জন স্থানীয় মহিলাকেও এই কাজে যুক্ত করে ফেলেন তিনি। সময় মতো কাজ শেষ করতে কাজ চলছে পুরোদমে। খোলাবাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে একেকটি হাঁসের দাম হলো এক হাজার থেকে বারোশো টাকা। কলকাতা থেকে এই হাঁস বিদেশে পাড়ি দিতে চলেছে। বিপ্লবের বাবা শিল্পী নবান সরকার বলেন, ‘এমন কাজ কখনও করিনি। চাহিদা অনুযায়ী হাঁস তৈরির জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। তার পরে, সঠিক আকার ও আয়তনের হাঁস তৈরি আয়ত্তে এনেছি। অনেক মহিলা এই কাজ করে ক্রমশ স্বাবলম্বী হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই হাঁস তৈরি করে প্যাকেটজাত করা হয়েছে। কলকাতা থেকে পাঠানো গাড়িতে আমাদের তৈরি করা হাঁসগুলি উঠে যাবে’।

আগামীদিনে রয়েছে আরও কাজের বরাত পাওয়ার সম্ভাবনা। তখন নিজেদের সঙ্গে আরও কয়েকজন স্থানীয় মহিলাকে এই কাজে নিয়োগ করার পরিকল্পনাও তৈরি করেছেন পিতা-পুত্র। এখানে এই পাইন কাঠের হাঁস তৈরির কর্মকাণ্ডে এইভাবেই যুক্ত হচ্ছেন নতুন-নতুন শিল্পী, এইভাবে ক্রমশ স্বাবলম্বী হচ্ছেন স্থানীয় মহিলারাও। পাইন কাঠের টুকরো কেটে অপরূপ শিল্পসুষমায় চমৎকার সব হাঁস তৈরি করছেন তাঁরা।

কাজ এখন প্রায় শেষের দিকে। হাঁস বানিয়ে অর্থ উপার্জন স্বাবলম্বনের অনুভূতি দিয়েছে গ্রামের মহিলাদের। বিপ্লব বলেন, ‘উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছি। এবার কলেজে ভর্তি হবো। আগে থেকেই খুঁটিনাটি জিনিস তৈরি করতাম। তার পরে সমাজ মাধ্যমে এরকম পোস্ট দেখে উৎসাহী হই। আমার পাঠানো নমুনা পছন্দ হওয়ায় তাঁরা দু’হাজারটি হাঁসের বরাত দিয়েছেন। সেগুলি তাঁরা বাইরে রফতানি করবেন বলে শুনেছি। দিনে প্রায় ১০টি হাঁস তৈরি করতে পারি। স্থানীয় মহিলাদের আরও বেশি করে কাজে নিযুক্ত করে তাঁদের স্বাবলম্বী করে তোলার ইচ্ছে আছে’।

তরুণ শিল্পী বিপ্লব সরকার একটি মাত্র হাঁসের মডেল বানিয়ে করে ফেলেছেন বাজিমাত। এমনকী আত্মনির্ভরতার পাশাপাশি এই বয়সেই তিনি অন্যদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কর্মসংস্থানের সুযোগ। আগামীদিনের শিল্পীদের কাছে সৃজনশীল এই তরুণ শিল্পী হয়ে উঠতে উপযুক্ত আদর্শ। □

দান এমনও হয়...

এক অবসর প্রাপ্ত বয়স্কা শিক্ষিকা এক ভীষণ গরমের দিনে ভিড়ে ঠাসা বাসে উঠলেন। তাঁর পায়ে ভীষণ ব্যথা। কোনো রকমে একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাস ছাড়তেই সিটে বসে থাকা এক বয়স্কা মহিলা ওই শিক্ষিকাকে বললেন, দিদিমণি, এখানে আসুন। শিক্ষিকা কোনোমতে তার কাছে আসতেই ওই মহিলা নিজের সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এখানে বসুন। শিক্ষিকা ধন্যবাদ জানিয়ে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, খুবই কষ্ট হচ্ছিল, আমাকে বাঁচালেন। মহিলার চোখে মুখে আনন্দের ঝলক দেখা গেল। শিক্ষিকা দেখলেন, ওই মহিলা খুবই গরিব।

কিছুদূর যেতেই শিক্ষিকার পাশের সিট খালি হয়ে গেল। কিন্তু ওই মহিলা আর এক মহিলাকে যিনি একটি শিশু কোলে নিয়ে কষ্ট করে দাঁড়িয়েছিলেন, তাকে ডেকে বসালেন।

পরের স্টপেজে শিশুকোলে মহিলা নেমে গেলেন। সিট খালি হয়ে গেল। কিন্তু ওই মহিলা বসার কোনো আগ্রহ দেখালেন না। তখনই একজন বৃদ্ধ বাসে উঠলেন। তিনি ওই বৃদ্ধকে সিটে বসিয়ে দিলেন।

পরের স্টপেজে ওই বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে অনেক যাত্রী নেমে গেল। বাস একেবারে খালি হয়ে গেল। কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই। শিক্ষিকা এবার ওই মহিলাকে নিজের পাশের সিটে বসালেন। তারপর বললেন, সিট কতবার খালি হলো কিন্তু আপনি নিজে না বসে অন্যদের ছেড়ে দিচ্ছিলেন। এর কারণ কী?

মহিলা অতি বিনয়ের স্বরে বললেন, দিদিমণি, আমি মানুষের বাড়ি কাজ করি। কাজ করতেই শহরে যাচ্ছি। আমার কাছে এত টাকা নেই যে কাউকে কিছু দান করি। তাই যাওয়া-আসার সময় রাস্তার উপর যদি পাথর পড়ে থাকে, ভাঙা কাচ পড়ে থাকে, সেগুলো আমি সরিয়ে দিই। পিপাসার্ত মানুষকে জল দিই। কাউকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করি। বাসে যাওয়া-আসার সময় যার প্রয়োজন তাকে সিট ছেড়ে দিই। আর তারা যখন আমাকে ধন্যবাদ দেয় তখন আমি আমার দারিদ্র্যের কথা ভুলে যাই। আমার সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

আর দিদিমণি, দুপুরে পার্কের বেঞ্চে বসে আমি যখন বাড়ি থেকে আনা খাবার খেতে বসি, তখন বেশ কতকগুলে পাখি, পিঁপড়া আমার কাছে এসে ভিড় করে। আমি তখন আমার খাবার থেকে ওদেরও দিই। পাখিগুলি খেয়ে আনন্দে গান গাইতে থাকে। ওরা আমার ঘাড়ে, মাথায় উড়ে এসে বসে। ভগবানের জীবকে খুশি দেখে আমার পেট ও মন দুটোই ভরে যায়। ভাবতে থাকি, বিনা পয়সায় তো আশীর্বাদ পাওয়া গেল! এতে তো আমার লাভই হলো।

শিক্ষিকা অবাক হয়ে গেলেন। এক গরিব, অশিক্ষিতা মহিলার থেকে অনেক বড়ো শিক্ষা লাভ করা গেল।

ছোট্ট বন্ধুরা, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ যদি এরকম ভাবত আর করত, তাহলে এই পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেত। শুধু টাকাপয়সা থাকলেই দান করা যায় না। তারজন্য একটি ভালো মন থাকা চাই।

নিলাদ্রি সরকার

নদ-নদী পরিচয়

মাতলা নদী

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ নদী মাতলা। প্রবাহ পথে নদীটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি প্রবাহ কুলতলি গরানবোস হয়ে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে সাগরে পড়েছে। অন্যটি বাসন্তী, পাঠানখালি, সূর্যবেড়িয়া হয়ে বিদ্যাধরীতে মিশেছে। বর্ষার সময় প্রচণ্ড জল বেড়ে যাওয়ার ফলে নৌকা বা লঞ্চ চলাচল করতে পারে না। আবার চৈত্র-বৈশাখ মাসে জল এত কমে যায় যে নৌকা বা লঞ্চ ঘাটে ভিড়তেই পারে না। বর্ষায় মাতলার জলে আশেপাশের গ্রামে বন্যার সৃষ্টি করে। বন্যার হাত থেকে গ্রামগুলিকে রক্ষা করার জন্য পাড় বরাবর বাঁধ দেওয়া হয়েছে

এসো সংস্কৃত শিখি-২৫

বালক: - বালকটি/একজন বালক।
বালকস্য - বালকটির/ বালকের।
অভ্যাস করি –
বালকস্য নাম কিম্ ?- বালকস্য নাম পাল:।
বালকস্য নাম কিম্ ?-বালকস্য নাম সন্তোষ:।
যুবক: - **যুবক**। যুবকস্য- **যুবকের**।
কস্য নাম পরিতোষ: ? -যুবকস্য নাম পরিতোষ:।
যুবকস্য নাম কিম্ ? -যুবকস্য নাম প্রলয়:।
এভাবেই – **ছাত্র: (ছাত্র), ছাত্রস্য- ছাত্রটির।**
শিক্ষক: -শিক্ষকস্য, বৃদ্ধ- বৃদ্ধস্য, নায়ক: -নায়কস্য।
প্রয়োগ করি –
সৌচিক:, ক্ষৌরিক:, নাপিত:, উন্মত্ত:, প্রচারক:, রক্ষক:,ভক্ষক,
বিচারক:, সমাজসেবক:, সঞ্চালক:।

ভালো কথা

ঘুড়ির সুতোর ফাঁসে কাক

সেদিন শাখায় সবে আমরা সূর্য নমস্কার করে সমতা করছিলাম, তখনই নজর পড়ল মাঠের একধারে কয়েকটা কাক একটি পায়রাকে ঠোকরাচ্ছে। আমাদের নগর শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ দেবব্রতদা দৌড়ে কাছে যেতেই কাকগুলি পালিয়ে গেল। দেবুদা পায়রাটিকে হাতে তুলে নিয়ে দেখল, মাঠে পড়ে থাকা ঘুড়ির সুতো পায়রাটির পায়ে ও দুই ডানায় ভালোমতো জড়িয়ে গেছে। দেবুদা আমার দিকে তাকাতেই আমি গণশিক্ষককে বলে দৌড়ে দেবুদার কাছে গিয়ে পায়রাটির পা ও ডানা থেকে সুতোর জট খুলে দিলাম। তারপর পায়রাটিকে ছেড়ে দিতেই উড়ে গিয়ে একটি দেওয়ালে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে আবার উড়ে চলে গেল। পায়রাটিকে কাকের মুখ থেকে বাঁচাতে পেরে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল।

কুণাল আগরওয়াল, ষষ্ঠ শ্রেণী, এস সি লেন, কলকাতা-৭

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) শা নু স অ	(১) ণ র কা অ হ ধি র
(২) প বি তি চা	(২) অ হা জ র র্জ না র

২০ মে সংখ্যার উত্তর
(১) অকালমৃত্যু (২) অকালপক্ক

২০ মে সংখ্যার উত্তর
(১) অকল্যাণকর (২) অকূলপাথার

উত্তরদাতার নাম
(১) রূপসা রায়, লেক টাউন, কলকাতা-৪৮। (২) শ্রেয়সী ঘোষ, মকদমপুর, ই বি, মালদা। (৩) শ্রেষ্ঠা দত্ত, অভিরামপুর, পঃ মেদিনীপুর। (৪) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

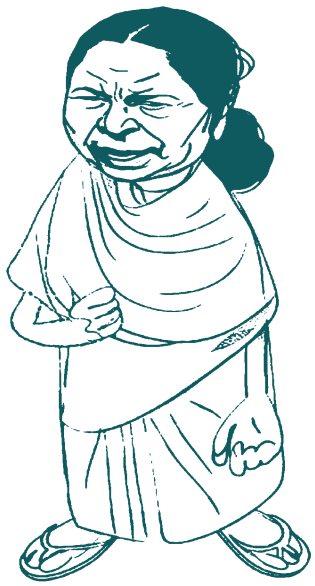

মুখ্যমন্ত্রীর চৈতন্য হোক

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

লোকসভা নির্বাচন উত্তরবঙ্গ থেকে যতই দক্ষিণবঙ্গে নেমে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল এবং তাদের সর্বময় নেত্রীর মুখের ভাষা এবং মনের অভিব্যক্তি ততই নিম্নগামী হয়ে আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য সেটাই নিয়ম। গঙ্গার উৎস মুখ গোমুখে যে নির্মলতা, কলকাতায় আসতে আসতে তা নর্দমার পাঁকে পরিণত হয়, এ তো সর্বজনবিদিত। দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের ভোটদানের ট্রেন্ড দেখে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল বুঝে গেছে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে হওয়া এই লোকসভা নির্বাচন নিশ্চিতভাবেই তাদের কাছে অশনিসংকেত যা শাসকদলের ওয়াটারলু হতে চলেছে। প্রায় হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভয়ে তাদের বোমা-বন্দুকধারী দুধেল গাই এবং তাদের যত্ন নেওয়া দাদার দল ডেরা ছেড়ে সদলে ভেগেছে। একদিকে সুকান্ত-শুভেন্দু-দিলীপের হুংকার, অন্যদিকে মোদী-যোগী-হিমন্তের সাঁড়াশি আক্রমণ, এই দুয়ের মাঝে পড়ে শাসকদলের স্যান্ডউইচ অবস্থা। এই সময় সূর্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির প্রচণ্ড দাবদাহে ঘাসফুল শুকিয়ে দড়ি হয়ে যাবার জোগাড়। তার উপর শাজাহানদের ভয় কাটিয়ে রাজ্যের ঘরে ঘরে 'বুক ফাটে তবু মুখ না ফোটা' অবলা রেখা পাত্র, মাম্পি দাসদের রণংদেহি মূর্তি– সব মিলিয়ে এখন শাসকদলের 'বল হরি হরি বোল' অবস্থা। তাই বড়ো নার্ভাস লাগছে। তা লাগুক। রাজনীতিতে উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় থাকবে। তা বলে নিজের নার্ভাসনেস কাটাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের সর্বময় কর্ত্রীকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ও ইসকনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের মিথ্যা গালাগালি দিতে হবে কেন?

গত ১৮ জুন পঞ্চম দফা ভোটের প্রাক্কালে আরামবাগের নির্বাচনী জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এবং স্বামী প্রদীপ্তানন্দের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেন। বলেছেন, 'বহরমপুরে এক মহারাজ আছেন, কার্তিক মহারাজ। আমি শুনেছি তিনি ভোটে তৃণমূলের এজেন্ট বসতে দেবেন না। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু যে লোকটা ওরকম কথা বলে তাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটার সর্বনাশ করছেন।' শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন এবং ইসকনের বিরুদ্ধেও চরম অপমানকর মন্তব্য করেন। বাঃ, মুখ্যমন্ত্রী বাঃ, একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আপনার কাছে 'লোকটা' হয়ে গেলেন? কী অসম্মানজনক মন্তব্য! অন্য কেনো সম্প্রদায়ের মোল্লা-মৌলভির সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতে পারতেন? ঘাড়ে সে মাথা আছে আপনার?

স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর এই অসত্য ভাষণের প্রতিবাদ জানাতে সময় নষ্ট করেরনি। তিনি বলেছেন, 'এমন কথা তিনি কখনোই বলেননি। হয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ দিন, নয়তো তিনি তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠাবেন।' কিন্তু প্রশ্ন হলো মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ এরকমভাবে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিদ্বেষী মন্তব্য করলেন কেন? আর কেনই-বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ইসকনের মতো বাঙ্গালি হিন্দুর সর্বাধিক শ্রদ্ধাকেন্দ্র আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এত ন্যক্কারজনকভাবে আঘাত করলেন?

একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যাবে এর একমাত্র কারণ হলো ভয়। দলের অন্দরের খবর হলো, চার দফা নির্বাচনে উত্তর ও মধ্যবঙ্গে তাদের দফারফা হয়েছে। বিজেপি সেখানে ক্লিন সুইফ করেছে। তবে শেষ ভরসা কী? শেষ ভরসা হলো দক্ষিণবঙ্গ। কিন্তু সেখানেও বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 'কার্পেট বোম্বিং' প্রচারে শুধু রচনা ব্যানার্জিই নয় দলনেত্রীও এখন চারিদিকে শুধু ধোঁয়া ধোঁয়া দেখছেন। বাঙ্গালি হিন্দুর সিংহভাগ ভোটই আজ বিজেপির দখলে। যে দু-চারগাছা হিন্দু উপরে টিএমসির পতাকা নিয়ে দলের হয়ে লম্পঝম্প করছে তারাও আড়ালে আবডালে দলের বাপবাপান্ত করছে— সে খবরও তাঁর কাছে আছে। তাই আজ বড়ো উদ্বিগ্ন। আর কোনমতেই হিন্দুদের বিশ্বাস করতে পারছেন না।

তবে বাকি রইল কারা? রইল তার ভাষায় ৩০ শতাংশ 'দুধেল গাই'। কিন্তু সেখানেও বিপদ। এবার তাদের পেছনে আদাজল খেয়ে লেগেছে মহম্মদ সেলিমের সিপিএম, আর নওসাদের আইএসএফ। এ যেন ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির। তাই যেন তেন প্রকারেণ এদের 'ব্লক-ভোট' তার চাইই চাই। এই ৩০ শতাংশ দুধেলকে কোঁচড়ে পুরতে তাদের বার্তা দেওয়া যে 'আমরা কেবল তোমাদেরই। এক্সক্লুসিভলি ইয়োরর্স। আমাদের হৃদয় ভরে শুধু তোমরাই আছো, শুধু তোমরাই। আমার এই সাম্প্রদায়িক তাস খেলা। এ যেন বউকে কত ভালবাসি বোঝাতে মাকে মেরে ঘরছাড়া করা।

পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় হিন্দুরা আজ সংখ্যালঘু। সেখানে হিন্দুরা ধীরে ধীরে নিজেদের অসুরক্ষিত অনুভব করছে। মুর্শিদাবাদ তার অন্যতম। সেখানে হিন্দু মাত্র ৩০ শতাংশ। কদিন আগে মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবির প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন ১৫ মিনিট সময় দিলে এই ৩০

শতাংশ হিন্দুকে তিনি ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দিতে পারেন। অর্থাৎ চাইলেই এরা হিন্দুদের যে কোনো মুহূর্তে খতম করে দিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে যে শয়তান এতবড়ো হুমকি দিল তার বিরুদ্ধে কিন্তু সামান্যতম প্রতিবাদটুকুও করলেন না। বরং যিনি এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানালেন সেই কার্তিক মহারাজ তার কাছে হয়ে গেল ঘোর শত্রু। অর্থাৎ যিনি হিন্দুকে আজ রক্ষা করার কথা বলবেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর চোখে ভিলেন হয়ে যাবেন। দু' কদম এগিয়ে তিনি বলেছেন, 'তিনি আগে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে শ্রদ্ধা করতেন' অর্থাৎ তিনি আর এখন সঙ্ঘকে শ্রদ্ধা করেন না। কার্তিক মহারাজকে তার সন্ন্যাসী বলতে লজ্জা লাগে। বাঃ কী সুন্দর মন্তব্য! হিন্দু সন্ন্যাসী তার কাছে চরম লজ্জার। হিন্দুকে বাঁচাবার কথা বলা কার্তিক মহারাজ তার চোখে সাধু নন; সাধু হলেন হিন্দুকে কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হুমায়ুন কবির। চমৎকার। তিনি পশ্চিমবঙ্গের ৭০ শতাংশ হিন্দুর মুখ্যমন্ত্রীই বটে! এসব দেখে মনে হচ্ছে হায়দরাবাদের কট্টর সাম্প্রদায়িক এআইএমআইএম দলের সঙ্গে টিএমসির আজ বিশেষ পার্থক্য নেই। কট্টর এআইএমআইএম সুপ্রিমো আসাদুল্লা ওয়েসির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কোনো প্রভেদ নেই।

আসাদুল্লার ভাই কবরুদ্দিন ওয়েসির বক্তব্য আর হুমায়ুনের বক্তব্য একই, যিনি কিছুদিন আগে বলেছিলেন, '১৫ মিনিট পুলিশ সরিয়ে নিলে তিনি হায়দরাবাদকে হিন্দু শূন্য করে দিতে পারেন।'

আসলে সংখ্যালঘু ভোটের কাঙাল মুখ্যমন্ত্রী আজ বাঙ্গালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। আর যে সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান, হিন্দু সংগঠন ও হিন্দু সন্ন্যাসীরা তার এই মতের বিরোধিতা করছেন তারাই হয়ে উঠেছেন তার চক্ষুশূল। মুখ্যমন্ত্রীর জানা উচিত, যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেবল মঠ মন্দিরে বসে সাধন-ভজন করার জন্য নয়, ভারতের সেবা করার জন্য। তাই এর নাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। ভারত সেবা মানে ভারতের হিন্দু ধর্মের সেবা। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিন্দু মিলন মন্দির। মঠের দুর্গাপূজায় আজ ও সাধু-মহারাজারা অস্ত্র পূজা করেন, তরবারি খেলেন, মায়ের কাছে ধর্মরক্ষার অঙ্গীকার করেন। স্বামী প্রণবানন্দজী বলেছিলেন, 'হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থ আছে, নাই শুধু সংগঠন শক্তি, এই শক্তি জাগাইয়া দিলে হিন্দু বিশ্বে অপরাজেয় হইয়া যাইবে। ...বাঙ্গালি হিন্দুর বাঁচার একমাত্র পন্থা বীর বিক্রমে যাবতীয় অন্যায় অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান এবং আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া।' তাই কার্তিক মহারাজ হুমায়ুন কবির ও তাদের প্রশ্রয়দাতা নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠে প্রকৃত সন্ন্যাসীর কাজই করেছেন। হিন্দুর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী এই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা— একা কার্তিক মহারাজের দায়িত্ব নয়, এই দেশের সমস্ত আধ্যাত্মিক সংগঠনের পবিত্র কর্তব্য।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন সন্ন্যাসীরা রাজনীতি করছেন। আচ্ছা বলুনতো, ক'দিন আগে 'বঙ্গীয় ইমাম পরিষদ' তাদের লেটারহেডে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সমস্ত মসজিদ ও মুসলমান সমাজের কাছে 'এই লোকসভা নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসবাদী বিজেপিকে পরাস্ত করতে টিএমসিকে সমর্থন জানানোর জন্য' যে বার্তা পাঠিয়েছে তা কোন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গ বলুন তো? মাসে আড়াই হাজার টাকা মাসোহারা (ভাতা) দিয়ে, এদের দিয়ে ভোট কিনতে নেমেছেন আপনি।

একবার ভাবুন তো আজ যদি রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকন, মতুয়া মহাসঙ্ঘ অথবা অন্য কোনো হিন্দু আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান ঠিক একই ভাবে হিন্দুদের কাছে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আবেদন করত তবে কি সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রলয় কাণ্ড ঘটে যেত না? বঙ্গীয় ইমাম পরিষদ যা করেছে তা গৌরবের, আর হিন্দু সংগঠন ঠিক একই কাজ করলে তা লজ্জার, এ কোন বিচার মুখ্যমন্ত্রীর?

হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ কি শুধু ভজন কীর্তন করা, প্রসাদ খাওয়া, স্কুল চালানো, খিচুড়ি বিতরণ করা? তবে পাকিস্তান আফগানিস্তানেও তো একসময় হিন্দু আধ্যাত্মিক সংগঠনের অভাব ছিল না। আজ সেখানে নেই কেন? কারণ হিন্দু সেখানে অবশিষ্ট নেই বলে। তাই হিন্দু বাঁচানোই আমাদের সকলের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। হিন্দু না বাঁচলে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইসকন কেউই বাঁচবে না। কদিন আগে মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে দাঙ্গা হয়েছে, দুদিন আগে ধুপগুড়ির মঠ মন্দিরে আক্রমণের খবর এসেছে। শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের কার্যালয়ে দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে আক্রমণ চালিয়েছে। দুষ্কৃতীরা কেউ ধরা পড়েনি। এ রাজ্যের সমস্ত মঠ মন্দিরের প্রধান, তার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের যারা দীক্ষিত, যারা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্ত্রশিষ্য, যারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুপ্রেরণায় জারিত সকলকে একযোগে এই হিন্দু বিরোধীদের বিরুদ্ধে লাড়াই করতে হবে। সকলকে মনে করতে হবে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের সন্ন্যাসীর অপমান আমার অপমান।

১৮৮৬ সালে ১ জানুয়ারি বলরাম বসুর বাগান বাড়িতে হাঁটতে হাঁটতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব হঠাৎ নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হ্যাঁগো আমাকে তুমি কী বুঝেছো?' গিরিশ ঘোষ তার অন্তর্দৃষ্টিতে ঠাকুরকে যা বুঝেছিলেন তাই উত্তর দিয়েছিলেন— 'তুমি আর কেউ নও। নররূপধারী পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। আমার মতো পাপী তাপিদের মুক্তির জন্য নেমে এসেছ।' ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমি আর কী বলবো, তোমাদের চৈতন্য হোক।' আজ কারোর কাছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন এবং তাদের দেবদুর্লভ সন্ন্যাসীকুলকে তাদের রাজনৈতিক শত্রু বলে মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করি, অসভ্যতায় অভব্যতায় তলিয়ে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রীর যেন জ্ঞানচক্ষুর উদয় হয়। হিন্দু সন্তমহাত্মাকে কীভাবে সম্মান জানাতে হয় তা যেন ঈশ্বর তাঁকে নতুন করে শিখিয়ে দেন। নয়তো আবার তাঁকে কষ্ট করে বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এসে বলতে হবে, 'মুখ্যমন্ত্রী তোর চৈতন্য হোক'। □

বাংলাদেশে ধর্মান্তরণে নতুন মিশন, শঙ্কিত হিন্দু সমাজ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে হিন্দু সমাজকে নিশানা করে ধর্মান্তরণের নতুন মিশনে নেমেছে উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। দাওয়াতের (নিমন্ত্রণ) নামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মান্তরিত করতে রীতিমতো সংগঠনের কর্মীদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন আইডি ও পেজ খুলে এই সংক্রান্ত প্রচার চালানো হচ্ছে। নিজেদের কর্মীদের শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধর্মান্তরিত করার কলাকৌশলও। নওমুসলিমদের (নতুন ধর্মান্তরিত মুসলমান) সুরক্ষার নামে এ ধরনের অপকর্মে যুক্ত হয়েছে একটি ব্যাংক-সহ একাধিক সামাজিক সংস্থা।

২০০৮ সালের পর ধর্ম মন্ত্রণালয় সরাসরি নওমুলিমদের পুনর্বাসনে অর্থায়ন বন্ধ করলেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সরকার পরিচালিত) তাদের জাকাত ফান্ডের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া চলমান রেখেছে। সারা দেশে বেশকিছু সামাজিক সংগঠন সংখ্যালঘুদের ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নামেমাত্র বরাদ্দ সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দুদেরকে বৈষম্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলেও মনে করেন অনেকে। তাদের ধর্মান্তরিত করতে এর সুযোগ নিচ্ছে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। এমন বাস্তবতায় শঙ্কিত হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস নামীয় ইসলামি সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ফারুক ও

সেক্রেটারি জেনারেল ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত বেশ কিছুদিন ধরে এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে চলেছেন, যাতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মান্তরণে তাদের দলের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল শিবিরের জন্য নতুন পুরস্কার ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, ব্রাহ্মণ মেয়েদের ধর্মান্তরণের জন্য তিন লক্ষ, ভারতীয় বাঙ্গালি মেয়েদের জন্যে দুই লক্ষ, নমশূদ্র মেয়েদের জন্য পঞ্চাশ হাজার আর পুরো পরিবারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে কথিত ধর্মান্তকারীদের।

সংগঠনের সব জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর পাঠানো হয়েছে এর কপি। অফিসের ঠিকানা দেওয়া আছে রাজধানীর উত্তর যাত্রাবাড়ির ৭৯/ক/৩ বাসা। ফেসবুক স্ট্যাটাসে প্রচারিত আরেক প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, 'মুসলমান ভায়েরা মূর্তি পূজারিদের (হিন্দুদের) প্রেমের ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করছে আর সেই সঙ্গে সাচ্চা মুসলমান জন্ম দিচ্ছে। সবচেয়ে এটাই ভালো লাগছে যে, আমাদের মুসলমান ভায়েরা এমনভাবে ব্রেনওয়াশ করছে যে সেই মেয়েরা ভাবছে যে তাদের সত্যি ভালোবাসছে। তাদের এই ভাবনা আমাদের মিশন পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে।' এই প্রচারপত্র মনোযোগ সহকারে পড়ার কথাও ফেসবুক স্ট্যাটাসে উল্লিখিত রয়েছে। আরেকটিতে লাভ জিহাদের এই কথিত মিশনের গ্রুপ লিডার হিসেবে জনৈক মামুনের নাম রয়েছে।

আরেকটি ফেসবুক গ্রুপে স্ট্যাটাসে কীভাবে হিন্দু মেয়েকে কথিত প্রেমের ফাঁদে ফেলা হবে তার একটি নির্দেশনাও রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'একটা দুইটা করে ফেক আইডি করবেন হিন্দু নাম দিয়ে। বিভিন্ন হিন্দু ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হবেন। যুক্ত হবার পর প্রথম কাজ হচ্ছে সেখান থেকে বেশিরভাগ মেয়েকে ছবিযুক্ত আইডি টার্গেট করবেন এবং হিন্দু মেয়েদের আইডি লিংক আমাদের গ্রুপে প্রেরণ করবেন এবং নিজেরা ফেসবুকে মেসেজ করবেন। আপনারা শুরুতেই মেয়েদের সঙ্গে সমস্ত প্রেমের আলাপ করবেন না। ধীরে ধীরে তাদের মনে প্রবেশ করতে হবে। আগে তাদের মন জয় করতে হবে। অতিরিক্ত প্রশংসা করতে যাবেন না। তবে মাঝে মধ্যে কথাশেষে হালকা-পাতলা প্রশংসা করবেন এবং প্রতিনিয়ত তার প্রতি যত্নবান দেখাবেন। তার প্রত্যেকটি বিপদে আপনি বেশি উদ্বিগ্ন দেখাবেন এবং কথাশেষে আল্লাহ ভরসা এবং ইনশাল্লাহ— এই কথাগুলো উচ্চারণ করবেন। তবে তাদের দেব-দেবী নিয়ে প্রথমে কোনো আপত্তি করবেন না, কাউকে খারাপ বলবেন না। তাহলে আপনার প্রতি বিরক্তি চলে আসবে তার মনে। আপনার স্কুলে-কলেজে অনেক হিন্দু বন্ধু আছে।

তাদের বিভিন্ন পূজায় আপনারা যান। তখন এই অনুষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের কুসংস্কৃতি সম্পর্কে আপনারা জেনে নেবেন। এভাবে করতে করতে একবার প্রেমে পড়লেই বিভিন্ন বাহানা করে এখানে-সেখানে দেখা করার কথা বলবেন। তবে প্রথম প্রথম তেমন কিছু করবেন না যাতে মেয়েটি সন্দেহ করে। তাকে আপনি এমন মনোভাব দেখাবেন যে, তাকে আপনি অনেক ভালোবাসেন। তার শরীর আপনার প্রয়োজন নেই। তার মনকে আপনি ভালোবাসেন। তাহলে দেখবেন অতি সহজে এবং তাড়াতাড়ি আপনার প্রতি বেশি দুর্বল হয়ে যাবে। আর দুর্বল হওয়ার পর আস্তে আস্তে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হবেন। আর একবার শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে আর কোনো টেনশন নেই।'

'মুফতি যুবায়ের আহমদের পরিচালনায় 'ইসলামি দাওয়াহ ইনস্টিটিউট' নামে আরও একটি প্রতিষ্ঠান দাওয়াতের নামে এক বছরের কোর্স বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বিভিন্ন কৌশলে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছে। মান্ডা শেষ মাথা গার্মেন্টসের সামনে ঠিকানা উল্লেখ করে পৃথক এই বিজ্ঞপ্তিতে 'অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত প্রশিক্ষণ কোর্স' চালুর কথা বলা হয়। কোর্সের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে 'হিন্দু-খ্রিস্টান-মুরতাদ ভাইদের দাওয়াত দেওয়ার পথ ও পদ্ধতি', 'হিন্দু-খ্রিস্টান- বৌদ্ধ-কাদিয়ানি ও বাহায়ী ধর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা', 'অমুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর।'

আরেকটি স্ট্যাটাসে লাভ জিহাদের কথিত মিশনের গ্রুপ লিডার হিসেবে মামুন নামে এক ব্যক্তির নাম রয়েছে। আরেকটি ফেসবুক গ্রুপের স্ট্যাটাসে কীভাবে হিন্দু নারীকে কথিত প্রেমের ফাঁদে ফেলা হবে, তার সঙ্গে একটি নির্দেশনাও রয়েছে। এতে ফেসবুকে হিন্দু নাম দিয়ে ফেক আইডি খুলে সনাতন ধর্মের মেয়েদের মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে ফেলে তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে এহেন উদ্ভট সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত উসকানিমূলক প্রচারণা, কথিত ধর্মান্তরণ মিশন অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় এই দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিশেষ করে হিন্দু পরিবারগুলো গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পড়েছে এবং তাদের মেয়েদের জীবনের, শিক্ষার ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তায় অধিকতর শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অনেক পরিবার ইতোমধ্যে তাদের কন্যা সন্তানদের স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে ভয় পাচ্ছে। এসব প্রতারণা ও উদ্ভট কার্যকলাপ সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতির পথে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। এহেন কার্যকলাপ বিশেষ ক্ষমতা আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এদিকে একটি বেসরকারি ব্যাংক ২০১০ সাল থেকে প্রতিষ্ঠা করেছে 'নওমুসলিম কেয়ার এইড'। নওমুসলিমদের আইনি সহায়তা, আর্থিক সহযোগিতা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। নওমুসলিমদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে তারা কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা। বর্তমানে ৬৪ জেলায় স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

মানবাধিকারকর্মী ও বিশিষ্টজনেরা বলছেন, প্রযুক্তি যুগে তরুণ প্রজন্মের একটা বড়ো অংশ অনলাইনে এই অশুভ পরিকল্পনায় যুক্ত। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ অনেক বেশি। এই সুযোগ কাজে লাগাতে এই উগ্র গোষ্ঠী ফেসবুক, ইউটিউব-সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে হাতিয়ার করছে। আবার প্রকাশ্যে সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে ধর্মান্তরণে উৎসাহ জোগাচ্ছে। এক্ষেত্রে নির্বিকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অন্য ধর্মের মানুষদের নানাভাবে দুর্বল করা ও দেশত্যাগে বাধ্য করার দূরদর্শী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই তারা এমন অপকর্ম শুরু করেছে।

তাঁরা বলছেন, ধর্মান্তরণের অশুভ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আইনের চোখে এই ধরনের কর্মকাণ্ড ফৌজদারি অপরাধ। ধর্ম ও সংবিধানও এটি সমর্থন করে না। তথ্যপ্রযুক্তি ও ধর্মীয় অবমাননা আইনে দ্রুত এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া-সহ উগ্র ধর্মবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক জাগরণ তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বলেন, এটি একেবারেই ফৌজদারি অপরাধ। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার শামিল। এক শ্রেণীর মোল্লাবাদী মানসিকতার লোকজন এই ধরনের কাজে লিপ্ত। এদের বিরুদ্ধে দেশকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের প্রচলিত আইন বিরুদ্ধ বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী আব্দুল মতিন বলেন, আইন এ ধরনের কাজ সমর্থন করে না। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মহম্মদ সামাদ বলেন, 'সংবিধান এ ধরনের কর্মকাণ্ড সমর্থন করে না।' প্রশাসনিকভাবে এই অপকর্মে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। বায়তুল মোকারম জাতীয় মসজিদের খতিব মুফতি মহম্মদ রুহুল আমিন বলে, যে কাউকে ইসলাম গ্রহণে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। তবে জোর করে কাউকে ধর্মান্তরিত করা, এর জন্য পুরস্কার ঘোষণা বা প্রলোভন দেখানোর অধিকার কারও নেই। এটি ধর্মের দৃষ্টিতেও অপরাধ।

সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে ও বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে সরকারকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রখ্যাত আলেম ও শোলাকিয়ার সাবেক ইমাম মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ। তিনি বলেন, এ ধরনের অপরাধ সমূলে নির্মূল করতে হবে। বাংলাদেশের

কেন্দ্রীয় পূজা সংগঠন 'বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের' সভাপতি সাংবাদিক বাসুদেব ধর— এমন অভিযোগ করেছেন, ধর্মান্ধরা নিজেদের ধর্মীয় রীতিনীতি সাধারণ হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিভিন্ন অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের দেশছাড়া করা হচ্ছে। এখন প্রলোভন দেখানো হচ্ছে, ফাঁদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। প্রশাসনের কেউ কেউ এসব ধর্মীয় অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। ধর্মান্তরিত করার কাজে নিয়োজিত অপশক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, হিন্দু নারীদের ধর্মান্তরিত করতে দেশজুড়ে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। সব ষড়যন্ত্রের উৎস এক। একটি ব্যাংক নওমুসলিমদের জন্য জাকাত ফান্ড গঠন করছে; হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরিত করতে ইউটিউবে প্রচার চলছে, প্রেমের অভিনয় করে তাদের বাগিয়ে আনা হচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন সংগঠন কর্মীদের জন্য টাকাপয়সা (পুরস্কার) ঘোষণা করেছে, যা অতীতে দেখা যায়নি।

হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার চিন্তা এক শ্রেণীর মোল্লাবাদী গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের প্রকল্প উল্লেখ করে প্রবীণ এই আইনজীবী বলেন, এগুলো হলো ধর্মীয় বিদ্বেষের নিকৃষ্টতম উদাহরণ। অথচ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের অপকর্ম চললেও সরকারি পর্যায়ে মামলা হচ্ছে না। এ কারণে সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

দাওয়াতের নামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মান্তরণের সাম্প্রদায়িক তৎপরতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ (ইসকন)। ইসকনের সাধারণ সম্পাদক চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী বলেন, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কিছু ধর্মীয় সংগঠন ধর্মীয় দাওয়াতের নামে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার-সহ বিভিন্ন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন-সহ এই উসকানিমূলক কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসে বিএনপি-জামায়াত জোট। এরপর থেকে টানা পাঁচবছর ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নওমুসলিমদের পুনর্বাসনের জন্য পৃথক বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই খাতে বিএনপি সরকারের আমলে প্রতি মাসে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। পাঁচ বছরে এক কোটি টাকা সরাসরি ব্যয় হয়েছে। ধর্মীয় নেতারা বলছেন, ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়াকে ২০০১ সালে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়, যার ধারাবাহিকতায় সামাজিক ভাবে এর বিস্তৃতি ঘটেছে এখন। এর আগে ১৯৮২ সালে গঠন করা জাকাত ফান্ড বিভাগে নওমুসলিমদের জন্য আর্থিক সহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ আছে।

২০০৮ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতার আসার পর থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নওমুসলিম পুনর্বাসন খাতের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। নওমুসলিম পুনর্বাসনের স্থলে দুঃস্থদের সাহায্যের কথা বলা আছে। তবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাকাত ফান্ড বিভাগের 'নওমুসলিম স্বাবলম্বীকরণ কার্যক্রম' এখনো চলমান। প্রতি বছর এই ফান্ড থেকে দুঃস্থ নওমুসলিমদের আর্থিক সহযোগিতা ও পুনর্বাসন করা হয়।

এদিকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ধর্মীয় বৈষম্যের কোনো পরিবর্তন আসেনি বলে মনে করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সংখ্যালঘুদের নানা প্রলোভনে ফেলে এক শ্রেণীর মানুষ তাদের ধর্মান্তরিত করছে বলেও অভিযোগ করেছেন ধর্মীয় নেতারা। তারা বলছেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি বাজেট বরাদ্দে সীমাহীন অবজ্ঞা, অবহেলা ও বৈষম্যের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে 'ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ব্যয় বরাদ্দ এবং উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দ রয়েছে ২ হাজার ৩৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে উন্নয়ন খাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ মাত্র ৬.৪ শতাংশ। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের সঙ্গে যা একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন চলে প্রতি বছরের বাজেট বরাদ্দ থেকে। আর হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টগুলো চলে আমানতের সুদের টাকায়। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নামে মোট স্থায়ী আমানতের ১০০ কোটি টাকা থেকে প্রতি বছরে ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ থেকে ৫ কোটি থেকে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সুদ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি পেয়ে থাকে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৭৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ হয় ৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের মাত্র ২.২৫ শতাংশ। জানতে চাইলে পলিশি রিসার্স ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, সবার আগে সরকারের জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানো জরুরি, যাতে সবাই এর সুবিধা পায়। এর মধ্য দিয়ে মানুষের সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি বলেন, উন্নয়ন করতে হলে সবার জন্য হওয়া উচিত। ধর্মমন্ত্রণালয়ের বাজেটে কোনো ধরনের বৈষম্য থাকা উচিত নয় বলেও জানান বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদের।

With Best Compliments from -

A
Well wisher

সংকটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা

অজয় ভট্টাচার্য

যে ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষকের চাকরি আপাতত বহাল রইল, স্কুল খোলার পর শিক্ষার্থীরা তাঁদেরকে কতটা শিক্ষক হিসেবে মেনে নেবেন, তার ওপর নির্ভর করছে আগামী দিনের শ্রেণী-শিক্ষণের সাফল্য। কারণ যোগ্য-আযোগ্যদের ভিড়ে প্রকৃত যোগ্য শিক্ষক কে এই প্রশ্নে শিক্ষার্থীরাও দ্বিধান্বিত। এই রকম একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিবেশে শ্রেণী-শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা কতটুকু আশা করা যায়, সে প্রশ্নও উঠে আসা স্বাভাবিক। জাতির স্বার্থে এটি একটি বড়ো প্রশ্ন । কিন্তু এর দায় কে নেবে? এসএসসি না সরকার?

শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। তাই শিক্ষকতা কোনো সাধারণ পেশা নয়। একটি মহান ব্রত। শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষকের পারদর্শিতার সঙ্গে আপোশ করা চলে না। তাই শিক্ষকের যোগ্যতা নিয়ে যদি শিক্ষার্থীর মনে সন্দেহ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক কতটুকু শিক্ষণ সহায়ক হতে পারে? ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতে শিক্ষকের চরিত্রে, কথায় ও কাজে কোনো পার্থক্য থাকবে না। ভারতীয় ভাবধারায় শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার পরেই শিক্ষকের স্থান। তাঁকে বলা হয় শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরুর কাছে শিক্ষার্থীরা প্রার্থনা করে— 'Lead me from the unreal to the Real./Lead me from darkness to light.' কিন্তু শিক্ষক নিজেই ঘুষ দিয়ে চাকরিতে নিযুক্ত হলে শিক্ষার্থীকে কীভাবে আলোর পথ দেখাবেন?

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ আদালতেও স্বীকৃত হয়েছে। দুর্নীতির এই অভিযোগকে শাসক দলও অস্বীকার করতে পারছে না। তাই দুর্নীতির এই আবহে সরকার পোষিত এবং সরকারি স্কুলগুলির পঠন-পাঠন কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা অনুমান করলে গা শিউরে উঠে। অথচ এই স্কুলগুলির পঠন-পাঠনের সঙ্গে বাঙ্গালির আবেগ জড়িয়ে। বাঙ্গালির অস্তিত্ব জড়িয়ে। কারণ এই স্কুলগুলির বেশিরভাগটাই বাংলা মিডিয়াম স্কুল। এখনও বাঙ্গালির সন্তান এই সব স্কুলে পড়ার সুবাদে বাংলা শেখে। খেটে খাওয়া গরিব মানুষের সন্তানেরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজের শীর্ষস্তরে পৌঁছাতে পারে এই সব স্কুলে পড়েই। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ-বা বিডিয়ো হতে পারেন। সর্বোপরি মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে সরকার পোষিত বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলিকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে।

নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের সবচাইতে ক্ষতিকারক দিক হলো, মানুষ ক্রমশ সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। সেক্ষেত্রে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে থাকবে, আর বাড়তে থাকবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা। ফলে বাংলা ভাষার ব্যবহার কমতে থাকবে। তাছাড়া মানুষ সরকার পোষিত স্কুলগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে, বাধ্য হয়ে বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলির দিকে ঝুঁকে পড়বেন। আর তার ফল হবে মারাত্মক। সংকটের মুখে পড়বে বাংলা ভাষা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি জাতি। আমাদের রাজ্যের যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা তাতে বেসরকারি স্কুলে পড়ানোর সামর্থ্য সবার নেই। সেক্ষেত্রে গরিব মানুষ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। সংবিধান প্রদত্ত শিক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। তাছাড়া ইংলিশ মিডিয়াম বা হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে বাংলা ভাষার ওপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই বাংলা-মাধ্যম

স্কুলগুলিকে টিকিয়ে রাখতে না রাখতে পারলে গোটা বাঙ্গালি জাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। বাঙ্গালি আজও বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়তে চায়।

কারণ বাঙ্গালি আজও মনে রেখেছে মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ। কিন্তু তার জন্য তো উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিকাঠামো চাই। আর সেটা গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের এবং তা রক্ষা করার দায়িত্বও সরকারের। অথচ শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ নিরসনের চেষ্টা না করে উলটে সেই অভিযোগকে পরোক্ষে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। যা থেকে প্রমাণিত হয়, দুর্নীতিকে উপড়ে ফেলতে সরকারও চাইছে না। শুধুমাত্র একটি দুর্নীতিপরায়ণ সিস্টেমকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে সরকার পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাকে আজ খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। দুর্নীতির এই আবহে স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছে। ফলে স্কুলগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। তাই কাজ চালাবার জন্য অতিথি শিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সম্প্রতি একটি স্কুলের অতিথি শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি জারি করে ছিল হুগলির পুরশুড়া চিলাডাঙি রবীন্দ্রবিদ্যাবীথি নামক একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল। পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অতিথি শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল এই স্কুলের। যাঁর মাসোহারা ৩০০০ টাকা হবে বলে জানানো হয়েছিল ওই বিজ্ঞাপনে। বিতর্কের সূত্রপাত এই মাসোহারা নিয়ে। যা পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজের দৈনিক মজুরির চাইতেও কম। যদিও সংশ্লিষ্ট স্কুলের টিচার ইনচার্জ জানিয়েছেন যে, ওই অতিথি শিক্ষককে সপ্তাহে ২-৩ দিন পড়াতে হবে। কিন্তু সেই হিসাবেও বেতন সম্মানজনক হয় না। বিজ্ঞাপন ছাড়াই অনেক স্কুল অতিথি শিক্ষক দিয়ে কাজ চালাতে বাধ্য হচ্ছে। তাঁদের বেতন ২০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এক্ষেত্রে স্কুলগুলির কিছু করার নেই। শিক্ষক সুলভ বেতন দেওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য স্কুলগুলির থাকে না। একদিকে স্বল্প বেতন, অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি। তাই সব মিলিয়ে আগামীদিনে শিক্ষকতার পেশাকে এড়িয়ে চলবেন মেধাবী শিক্ষার্থীরা। অথচ আগামী প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য এই জায়গাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই কাজের জন্য জনগণ যাঁদেরকে ভোটে জিতিয়ে ক্ষমতায় পাঠান, তাঁদের একটি অংশ দুর্নীতির সঙ্গে আপোশ করে আগামী প্রজন্মকে উচ্ছন্নে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। এর পরও এই দুর্নীতিপরায়ণ সিস্টেমকে সমর্থন করার অর্থ বাঙ্গালি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া। গরিব মানুষকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

শিক্ষক নিয়োগে যে অনিয়ম হয়েছে, সেকথা এসএসসিও স্বীকার করে নিয়েছে। যোগ্য-অযোগ্য ভেদাভেদে তাঁরা অক্ষম একথা জানিয়ে দেওয়ার পরেও সাময়িক বাঁচার তাগিদে এসএসসি উলটো সুরও গাইছে। তবুও মানুষ এর সুষ্ঠু সমাধান চাইছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রকৃত যোগ্যদের পৃথক করার তথ্য প্রমাণ যদি সত্যি এসএসসির কাছে থাকত, তাহলে তো হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না। হাইকোর্টেই কেসের সুষ্ঠু সমাধান হতো।

আসলে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য শাসক দল নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডকে আপাতত ভেন্টিলেশনে পাঠাতে চাইছিল। আর তার জন্যই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে নামি দামি অ্যাডভোকেট নিয়োগ করেছিল এই কেসে। তাই এ প্রশ্নও উঠে আসছে যে, একটি দুর্নীতিপরায়ণ সিস্টেমকে বাঁচিয়ে রাখতে শাসক দলের এত মরিয়া প্রচেষ্টা কেন? তবে কি পর্দার আড়ালে আরও কিছু অপেক্ষা করে আছে? যা প্রকাশ্যে এলে বিড়ম্বনা আরও বাড়বে। □

লাল সন্ত্রাস আর নীল-সাদা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য কী?

সুবল সরদার

মহান ভারতের মহান জনগণ, মহান সংবিধান, মহান সুপ্রিম কোর্টের মাঝে, মহান গণতন্ত্রের অষ্টাদশ নির্বাচনের রক্তক্ষয়ী লড়াই চলেছে পশ্চিমবঙ্গের মাঠে, ময়দানে, গরমে, কালবৈশাখী ঝড়ের মধ্যে। নির্বাচন এখন শেষ হয়েছে। এবার দেখা যাবে দিল্লির মসনদে কে বসে। জনগণ এখন শুধু ভোটার নয়, দায়িত্বশীল নাগরিক। তাই ভোটদানের মাধ্যমে সরকারের পালাবদল হয়। এক সরকার যায় আর এক সরকার আসে। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ লালসন্ত্রাসের পর এক নতুন নীল সাদা সরকার ভূমিষ্ঠ হয় আশা ও স্বপ্নের দোলা চেপে। কলকাতা লন্ডন হবে, প্যারিস হবে, আরও কত কী স্বপ্ন ছিল। শিল্প হবে, বেকাররা চাকরি পাবে তৃণমূল দলের নেত্রী স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন। আমরাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। অচিরে ভুল ভাঙে। হাট্টি মাটিম টিমের মতো তারা মাঠে ডিম পাড়ে। অসুন্দররা ফুলের সৌন্দর্য বর্ণনা করে, কবিতা লেখে 'এপাং ওপাং ঝপাং' সব চিৎপটাং। গোলাপের পাহাড়ের মতো সে এক বীভৎস মৃত্যু উপত্যকা সৃষ্টি করে। কলকাতায় পা দিয়ে রবীন্দ্র সংগীত শুনলাম।

এই রাজ্য সরকারের গায়ে হাজার ব্যাধিতে ভরা। নাটুকেপনা দেউলিয়া করে তুলেছে রাজ্যকে। রাজ্য রসাতলে যাচ্ছে। জলের (কুড়ি টাকা মদের পাউচে) ফোয়ারায় রাজ্য ভাসছে। এখন সব চুরি গেছে— চাকরি চুরি, বালি চুরি, কয়লা চুরি, গোরু চুরি, টাকা চুরি। এখন কাটমানি কালচার চালু হয়েছে। ভয়ংকর সন্ত্রাস থেকে আরও ভয়ংকর সন্ত্রাসের কবলে রাজ্যের মানুষ। লাল সন্ত্রাসের চাইতে ভয়ংকর নীল সাদা সন্ত্রাস। ভয়ংকর সন্ত্রাসের কোনো চরিত্র হয় না। তার একটাই চরিত্র শুধু সন্ত্রাস করা। মানুষ দিশেহারা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় তারা প্রতিবাদ, প্রতিরোধের জন্যে পথে নেমেছে। মুখ খুলেছে। মাঠে ময়দানে নেমে লড়াই করছে। সন্দেশখালিতে মা-বোনেদের প্রতিবাদের লড়াই চলেছে।

খেলা হবে দিয়ে এই সরকার শুরু হয়েছে। এখন খেলা শেষ। নেত্রীকে কখনও পা হাত ভেঙে ব্যান্ডেজ বেঁধে, কখনো-বা মাথা ফেটে নেত্রীর রক্ত ঝরতে দেখা গেছে। খেলা জমে উঠেছে। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে হাজার দুর্নীতিতে তাঁর সরকার জড়িয়ে পড়েছে। মন্ত্রীসভার আজ অনেকে জেলের ঘানি টানছে। এই সরকার জল ছাড়া মাছের মতো খাবি খাচ্ছে এই বুঝি প্রাণ যায়। যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে, জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে, যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয় তাদের এরকম অবস্থাই হয়।

দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা জেলের ঘানি টানে। তারা মুক্তি খোঁজে হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টের দরজায়। তারা কখনো অভিযোগ প্রমাণ করতে চায় না। তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলার নিষ্পত্তি হোক তারা কখনো চায় না। অবশ্য হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিমকোর্ট— কেসের নিষ্পত্তি কদাচিৎ হয়। এটা নাকি দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি। তাই হার-জিৎ, জয়-পরাজয় জীবদ্দশায় কেউ দেখতে পায়নি। বিচারালয় মুক্তির মন্দির নাকি দীর্ঘমেয়াদি পথের দিশারি। সেই কারণে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মামলা সুপ্রিম কোর্টে দু' বছর ধরে অপেক্ষা করছে বিচারের আশায়। সেখানে নাকি এই মামলার শুনানির সময় হচ্ছে না। অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতি করতে যারা সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করে তারা সুপ্রিম কোর্ট থেকে রাতারাতি রক্ষাকবচ পেয়ে যায়। সিবিআই শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের এবং এই দুর্নীতির মাথাদের ধরতে বা জেরা করতে পারবে না। দুর্নীতি তদন্ত করতে পারবে না এমন আদেশ দেশের সর্বোচ্চ মহামান্য আদালত থেকে পাশ হচ্ছে। তার মানে যত খুশি দুর্নীতি করো কুছ পরোয়া নেহি, কারণ মাথার উপর সুপ্রিম আছে। অন্যদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে জাস্টিস সঞ্জীব খান্না এবং জাস্টিস দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে, কারণ তিনি নাকি এই লোকসভা নির্বাচনের স্টার ক্যাম্পেনার ছিলেন। সুপ্রিম যুক্তি মানতেই হয়। কোটি কোটি টাকার মদ কেলেঙ্কারি থেকে বিদেশি ফান্ড ঢোকে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। খালিস্তানির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি জড়িত। তারপরও তিনি অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেলেন। অবশ্য তাঁর মন্ত্রীসভার দুজন মন্ত্রী এখনো জেলে বন্দি। জনগণ ক্রমশ বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাচ্ছে।

তারা এখন প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। 'The bail granted to Arvind Kejriwal is a glaring example of the biased and unjust decision made by the judiciary in the history of India.' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী হরিশ সালভে।

বর্তমানে এরকম কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। মানুষ প্রশ্ন তুলছে, সংবিধান মোতাবেক আইন চলছে না। অভিযোগ উঠছে, কখনো সুপ্রিম কোর্ট বেশি সক্রিয়, কখনো নিষ্ক্রিয়। মানুষ বিপন্নতা বোধ করে। মনে হয় গ্রান্ডট্র্যাঙ্ক রোড ধরে কলকাতা এখন দিল্লির দিকে যাচ্ছে। দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের মুক্তি আছে মুক্তির মন্দিরে। যে নাটক দেখতে বাকি ছিল সেই নাটক দেখছি এখন আমরা। গণতন্ত্রের এ গরিমা নয়, গরল। উত্তাপের আবহে নির্বাচন কাটবে। কিছু রক্ত ক্ষয় হবে। তারপর দেখা যাবে শেষ হাসি কে হাসে? □